

চেতনার অন্বেষণে

জানুয়ারি সংখ্যা, ২০২২

যুক্তিবাদীরা গ্রুপ কর্তৃক প্রকাশিত

সূচি-

যুক্তিবাদীরা গ্রুপের পত্রিকা **'চেতনা'** জানুয়ারি সংখ্যা, ২০২২।

পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো আমাদের ওয়েবসাইটে।

সম্পাদকমন্ডলী- যুক্তিবাদীরা।

যোগাযোগ:
ই-মেইল - yuktibadira@gmail.com
টেলিগ্রাম- https://t.me/Yktibadira

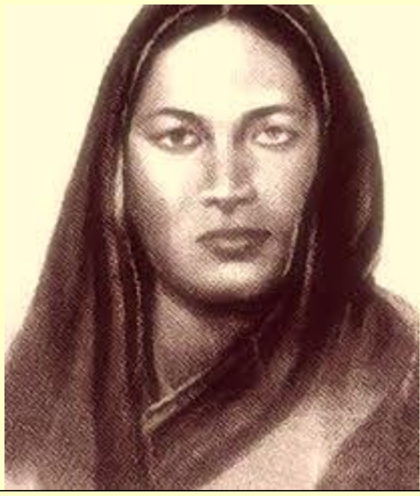
মূল্য- ০০ টাকা
ওয়েবসাইট-
https://rationalists.wixsite.com/chetona

প্রবন্ধ ও নিবন্ধ:

কবিতা:

সম্পাদকীয়

গতবছর জানুয়ারি সংখ্যা দিয়ে আমরা ম্যাগাজিনের সূচনা করেছিলাম আজ নতুন বছরে আবার জানুয়ারি সংখ্যা চলে এলো। নতুন বছর, নতুন করে ম্যগাজিনকে সাজানোর চেষ্টায় আরও একধাপ এগিয়েছি। অনেক পাঠক ও লেখক এগিয়ে আসছেন। বহু মানুষের পত্রিকা নিয়ে মতামতও সমৃদ্ধ করেছে। আপাতত বইমেলা হবে বলেই জানা গেছে তাই বইমেলায় দেখা হবে অনেকের সাথে। **১২**ই জানুয়ারি ছিল বিপ্লবী মাস্টারদা সূর্যসেনের শহীদ দিবস, তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। ম্যাগাজিনটিও নতুন বছরে নতুন নামে প্রকাশিত হলো- এখন থেকে নাম পরিবর্তন হয়ে 'চেতনার অন্বেষণে' করা হয়েছে। চেতনার অন্বেষণ করে চলুক পত্রিকাটি এই শুভকামনা করছি।



ফতেমা শেখ। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজ সংস্কারক।

অজ্ঞানতার বিজ্ঞাপন

-মহম্মদ মহসীন

ধর্ম প্রকৃতই অন্তঃসারশূন্য। তবুও চারিদিকেই তার ব্যাপ্তি। এই বিস্তৃতির কারণ কী? মেজোরিটি ম্যাটারস। বিজ্ঞাপন আমাদের জীবনকে অনেকটাই চালিত করে থাকে। নাস্তিকতা মানুষকে অর্জন করতে হয়। ধর্মকে অর্জন করতে হয় না। জন্মের সাথে সাথেই তা ঘাড়ে চড়ে বসে।

মানুষ ধর্মকে অর্জন করে না গ্রহণও করে না। আবার বলতে গেলে বর্জনও করে না। বর্জন করতে চাই শিক্ষা। ধর্ম হল তার পারিবারিক সূত্রে পাওয়া এক অন্ধবিশ্বাসের গুপ্তধন। যা নিয়ে সে বেশী নাড়াঘাঁটা করেও দেখে না। বরং ভক্তি ছেদ্দা করে কুলুঙ্গিতে তুলে রাখে। তাই তার স্বরূপ বিশেষ বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না।

ছোট থেকেই তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে ধর্মের নানান রিফ্লেক্স। অনুপ্রবিষ্ট হতে থাকে ধর্মাহংকার। তাই ধার্মিক মাত্রেই গর্বিত হিন্দু না হয় গর্বিত মুসলমান নাহয় গর্বিত অন্য কিছু। ধর্ম গর্বে গর্বিত। জীবনে আর সকল সমালোচনা স্বাগত হলেও, ধার্মিকের কাছে তার ধর্মের সমালোচনা মানেই এক নিষিদ্ধ বস্তু। ধর্মের সমালোচনায় ধার্মিক একেবারেই অসহিষ্ণু। ধর্মে প্রশ্ন নিষিদ্ধ। প্রশ্ন কোরো না।

শিশু এভাবেই বড় হতে থাকে। সে যত বড় হয়, ততই পাল্লা দিয়ে বাড়ে তার কুসংস্কার। তার অন্ধবিশ্বাস। জীবনশৈলীতে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে জড়িয়ে মানবিক যুক্তিশীলতার রস শুষে জীবনকে একটা দাসত্বের আধারে পরিণত করে। ধর্মের দাস হয়ে সে তখন গর্বিত ধার্মিক। কুসংস্কারাচ্ছন্নতার নির্বোধ প্রতিমুর্তি।

রাস্তার ধারে দেখবেন, হলুদ রঙের এক ধরণের লতা। কোনো গাছকে আশ্রয় করে বাড়ে। গাছটিকে ঢেকে ফেলে। গাছে রস খেয়ে তাকে ছিবড়ে করে দেয়। গাছটির নিজস্বতা আর থাকে না। বাইরে থেকে দেখতে সে যতই হোক না সোনার মতো লতা শোভিত। সোনার লতায় ঢেকে গিয়ে সে যায় লুকিয়ে। তার কত না শোভা।

ধর্ম মানুষের যুক্তিশীল মনকে একেবারেই শেষ করে দেয়। ধর্মশৈলী প্রতিনিয়ত মানুষের যুক্তিশীলতার রস শুষে তাকে আর মানবিক ভাবনা ভাবানোর যোগ্যই রাখে না।

একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। কোনো একটি রাজনৈতিক দল ঘোষণা করলো, তাদের দলে যারা আসবে, তারা ক্ষমতা দখল করলে, খুন-ধর্ষণ-মদ-নারী বিলাসিতার ব্যবস্থা তারা করে দেবে। কী বলবেন? তাদের প্রতি আপনার মনোভাব কেমন হবে? এখন দেখবেন, ধর্মের ব্যাপারটাও তেমনই। দেখবেন, প্রায় প্রতিটি ধর্মে, স্বর্গ, স্বর্গে আমোদ প্রমোদ বিলাস ব্যসনের প্রলোভন দেখায়। মানুষকে প্রতিনিয়ত কুসংস্কারের অনুশীলনের মাধ্যমে তাতে বিশ্বস্তও করে তোলে।

মানুষ নির্বোধ হলে নির্লজ্জও হয়ে থাকে।

দেখবেন, যারা হোমিওপ্যাথীর পক্ষে তারা জানেনই না যে উচ্চমাত্রার হোমিওতে এক বিন্দুও ওষুধ থাকে না। অথচ তারা ঔষধবিহীন চিকিৎসাতেও আগ্রহী নন। আসলে তাঁরা এই অজ্ঞানতা হেতু হোমিওতে আস্থা রাখেন। যাঁরা আঙুলে আংটি নিয়ে ঘোরেন, তাঁদের অজ্ঞানতার কারণেই এইসব স্টোন ধারণ করেন। ধারণ করেন, তবু লজ্জাও পান না।

এই নির্লজ্জতা গোটা সমাজে।

বহু কিছু পড়া শুনা করেছেন। ডিগ্রীও অর্জন করেছেন। এঁরা আত্মা মানেন, ভূত মানেন না!

যিনি আত্মা মানেন, ভগবান মানেন, ভূতও মানেন, তাকর মানামানির ব্যাপারটা বোঝা যায় যে নির্বুদ্ধিতার চূড়ায় থাকলে লজ্জার বালাই থাকেনা। নির্লজ্জভাবে আঙুলের আঙটি প্রদর্শনে এতটুকু কুণ্ঠিত নন। কিন্তু যিনি ভগবান মানেন, কিন্তু ভূত মানেন না, তাঁর লজিক বিশ্বাসসর্বস্ব লজিক।

ধার্মিকদের ভক্তি এক আজব বস্তু। ভক্তি যার স্কন্ধে ভর করে তাঁকে বলা হয় ভক্ত। প্রায়শ শিক্ষিত ধার্মিকে বলে থাকেন, তিনি সর্ব ধর্মের ভক্ত। নানা ধর্মে নানান বৈপরীত্য। কোনটি একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী, কোনটি বা বহু-ঈশ্বরে। সব ধর্মের ভক্ত অবশ্য 'এক = বহু' ভাবতে সাগ্রহে অভ্যস্ত। একে নিছক মূর্খামি ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি?

এবার এক নামকরা চিকিৎসকের কথা বলি। ইনি চিকিৎসাক্ষেত্রে এক অতি খ্যাতনামা ব্যক্তি। আমার সাথে কথায় কথায় জানালেন, উনি মকর স্নানে যাচ্ছেন। শুনে প্রথমে বেশ অবাক হয়েছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম, আমরা সাধারনত ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার এমনকি শিক্ষকদেরও শিক্ষিত বলেই ভেবে থাকি।

এই চিকিৎসক ভদ্রলোকের কথাই বলি। ইনি বারো ক্লাসের পর থেকেই মেডিকেলে। ফিসিওলজি, অ্যানাটমি, মেটিরিয়া মেডিকা, ডিসেকসন, ফার্মাকোলজি নিয়েই তাঁর জগৎ।

তিনি তাহলে শিক্ষিত হলেন আর কখন? অথচ দেখুন, তাঁকেই আমরা অনেকে বুদ্ধিজীবির দলে ফেলি।

যে ভদ্রলোক জীবন বোধের সিনেমা দেখেন, লাইব্রেরী থেকে বই এনে নিজের ছোট দোকানটিতে বসে বইটি পড়ে চলেন, দোকানে আসা লোকের সাথে সমাজ অর্থনীতি ধর্ম রাজনীতি নিয়ে নিজের মতামত উপস্থাপন করেন, তাঁর ডিগ্রী দেখে তাঁকে আমরা অনেকেই

শিক্ষিত বলতে আদৌ রাজী নই। এখানে নিহিত আছে ধর্ম ব্যাপ্তির সূত্র। অজ্ঞানতাই হ'ল ধর্ম ও ধার্মিকতার ভিত্তি। গড্ডালিকাপ্রবাহে চিন্তাস্রোত অপরের ধারায় প্রবাহিত। এতে কখনই মনুষ্যত্বের বিকাশ হতে পারে না। অন্ধবিশ্বাস থাকে তাঁর মনে সারা জীবন। অশিক্ষা থেকেই যায়। মূর্খামির জানান দেখা যায় ধর্মাচরণের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত। তিনি নিজের মূর্খামির খবর জানতে পারেন না সারা জীবনেও।

যে সকল ধার্মিক নিজেদের যুক্তিবাদী মনে করেন, তাঁরা চিন্তা করুন, আপনার ধর্ম কেন বাস্তব জমির উপর দাঁড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠীত করতে পারেনা। কেন তাকে অলীক অলৌকিক মিথ্যার শরণাপন্ন হতে হয়।

জন্ম যার মিথ্যাচার দিয়ে, সে জিনিস কিভাবে আপনাদের কাছে এত গ্রহণযোগ্যতা পায় কেন?

একটু ভাবুন। ভাববাদী কথা দিয়ে গোঁজামিল দিয়ে কখনই সত্যকে আশ্রয় করা যায় না।

বোমা বা পিস্তল কোনও বিপ্লবের জন্ম দেয় না। বিপ্লবের তরোয়াল ক্ষুরধার হয় নিকষ পাথরে ভাবনার ঘাত প্রতিঘাত দিয়ে।

-ভগৎ সিং

কেন আমি অজ্ঞেয়বাদী?

-পরাগ সেন

ধর্ম, ভূতপ্রেত, আত্মা, আত্মার বিভক্ত হওয়া ও তার ট্রান্সফার এগুলো শুনে আমি হাসব না কাঁদব বুঝতে পারি না। তবে দুটো জিনিস আমাকে খুব অবাক করে, যার জন্য আমি অজ্ঞেয়বাদী, কিন্তু আস্তিক বা নাস্তিক কোনোটাই নই। একটি হল শক্তি, অপরটি হল জীবন/চেতনা/নিজের শরীরের মাধ্যমে নিজের বহিঃপ্রকাশ, নিজস্ব অনুভূতি বা আত্মপলব্ধি। এবার বলি, গন্ডগোলটা কোথায় কোথায়?

(১) পদার্থবিজ্ঞানে শক্তির কোনও মৌলিক সংজ্ঞা দেওয়া ভীষণ মুশকিল। ইন ফ্যাক্ট, নেই।
(২) মনে করা হয়, মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ (ধনাত্মক শক্তি বা ভর এবং ঋণাত্মক শক্তি বা মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র কাটাকুটি করে) শুন্য। কিন্তু কিভাবে প্রথম শক্তির উপস্থিতি সম্ভব হল তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ বিগ ব্যাং-এর ঠিক পরমুহূর্তের (১০^-৩৬ সেকেন্ড অবধি) কথা জানা যায় না। গুথের ইনফ্লেশনারি বিগ ব্যাং মডেল (যা বর্তমানে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য) বলে, "Just before the Big Bang, space was filled with an unstable form of energy, whose nature is NOT YET KNOWN. At some instant, this energy was transformed into the fundamental particles from which arose all the matter we observe today. The known laws of nature can in principle explain where the matter and energy in the universe came from, PROVIDED THERE WAS AT LEAST A TINY SEED OF ENERGY TO BEGIN WITH" (সূত্র: Harvard Smithsonian Center for Astrophysics).
এখন প্রশ্ন, এই শক্তি/ম্যাটার, স্থান, সময় কোথা থেকে ও কেন এল? স্ট্রিং থিওরি দিয়ে একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে। এই মত অনুযায়ী অন্য কোনও মহাবিশ্বের সাথে সংঘর্ষের ফলে আমাদের মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। সেখানেও প্রশ্ন উঠবে আগের মহাবিশ্বের উদ্ভব কিভাবে?

(৩) এলান গুথের তত্ত্ব অনুযায়ী "A small volume of space occupied by a virtual particle pair (due to quantum fluctuations) could have ballooned to become the vast universe we see today. Alan Guth, one of the main brains behind inflationary cosmology, thus described the universe as-the ultimate free lunch."
এখানেও সেই একই প্রশ্ন এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র স্থানের আবির্ভাব কিভাবে? আর কেন স্থান 'নেই' না হয়ে 'আছে'?
তাছাড়া অবজার্ভবল ইউনিভার্সের বাইরের খবর জানা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, infeasible. মনে করা হয়, মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত ও ত্বরান্বিত হচ্ছে। কিন্তু স্থানের আবির্ভাব ব্যাপারটাই বেশ অদ্ভুত। আবার অন্যদিকে স্থানহীনতা আমাদের কল্পনার বাইরে। একটা লিংক দিলাম। https://www.quora.com/What-caused-the-Big-Bang-6?
(৪) বিখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন, 'ঈশ্বর থাকতে পারেন, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মান্ডের সৃষ্টি রহস্য ব্যাখ্যার জন্য তাঁকে প্রয়োজন নেই'। কারণ হকিং মাল্টিভার্স থিওরিতে বিশ্বাস করতেন এবং তাঁর মতে অন্য মহাবিশ্বের সাথে সংঘর্ষের ফলে আমাদের মহাবিশ্ব তৈরী হয়েছে। কিন্তু মাল্টিভার্স থিওরি সম্পর্কে বিরোধিতা বা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কসমোলোজিস্ট পল ডেভিস বা নোবেলজয়ী ডেভিড গ্রসের মত পদার্থবিদরা। মাল্টিভার্স থিওরিতে প্রশ্ন উঠতে পারে আগের মহাবিশ্ব কিভাবে ও কেন আবির্ভাব হল! 'মাল্টিভার্স এমনিই আবহমান কাল ধরে আছে' এই বক্তব্যের সাথে 'ঈশ্বরকে কেউ তৈরী করেননি, ঈশ্বর (impersonified God) এমনিই আবহমান কাল আছেন'-এই বক্তব্যের মূলগত তফাৎ কোথায়!

(৫) মনে করা হয়, পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব হয় আনুমানিক ৩৫০ কোটি বছর পূর্বে মাইক্রোঅর্গানিসম-এর মাধ্যমে, সম্ভবত ধূমকেতুর থেকে। এর প্রমাণ মেলে সমুদ্রের তলদেশে হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের অবশেষ থেকে। RNA World Hypothesis থিওরিটা অনেকটা এইরকম। কেমিক্যাল স্যুপ (সমুদ্রের জল+ধূমকেতুর রাসায়নিক পদার্থ)---RNA---প্রোক্যারিওট (যেমন, ব্যাকটিরিয়া, আর্কিয়া)---বিভিন্ন ধরণের প্রোক্যারিওটের সহাবস্থানের ফলে (Endosymbiotic Theory) প্রোটিস্ট---দু'ধরণের

প্রোটিস্ট প্রোটোজোয়া (সালোকসংশ্লেষে অক্ষম শুধু মাইটোকন্ড্রিয়া বিশিষ্ট) এবং প্রোটোফাইটা (সালোকসংশ্লেষে সক্ষম সবুজ প্লাস্টিড এবং মাইটোকন্ড্রিয়াবিশিষ্ট)---প্রাণী এবং উদ্ভিদ যথাক্রমে। এই হিসাবে দেখতে গেলে প্রাণী থেকেই উদ্ভিদের উদ্ভব হয়েছে। প্রাণী ও উদ্ভিদ উভয়েরই প্রাণ আছে। ল্যাবরেটরিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কি সম্ভব? প্রাণের সংজ্ঞাই বা কি?
নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটির গ্রসম্যান স্কুল অফ মেডিসিনের জিনোম টেকনোলজি সেন্টারের ডিরেক্টর Dr. Adriana Heguy-র বক্তব্য অনুযায়ী ল্যাবরেটরিতে একদম স্ক্র্যাচ থেকে বা শুধুমাত্র জড়পদার্থ থেকে কোনও জীবিত কোষের সাহায্য ছাড়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। এমনকি গবেষক Craig Venter-এর সিন্থেটিক ব্যাকটিরিয়া জিনোম সংক্রান্ত যুগান্তকারী গবেষণাটির (২০১০) ক্ষেত্রেও এই একই বক্তব্য প্রযোজ্য। নিচের তিনটি লিংক দেখা যেতে পারে।

1) https://www.quora.com/Have-any-of-the-experiments-to-create-life-been-successful
2) https://www.quora.com/Has-life-been-created-in-the-laboratory
3) https://www.quora.com/Who-was-the-scientist-who-recently-made-life-from-scratch-Can-anyone-provide-the-details-of-this-experiment

সাম্প্রতিককালে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটিতে প্রকাশিত তমাল দাস ও তাঁর টিমের একটি গবেষণায় (২০১৯) উঠে এসেছে- "energetically feasible interactions between just two small molecules -- hydrogen cyanide and water -- could give rise to most of the important precursors of RNA and proteins." এটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক উন্মোচিত করেছে, কিন্তু সেটি কৃত্তিম প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট নয়।

(৬) প্রাণকে কি সংজ্ঞায়িত করা যায়? না, যায় না। প্রাণের কোনও মৌলিক সংজ্ঞা নেই। প্রাণের প্রধাণ এবং সাধারণ ধর্ম শারীরবৃত্তীয় কার্যসমূহ পরিচালনা করা বা উল্টোটা। অর্থাৎ শারীরবৃত্তীয় কার্যসমূহ পরিচালিত হয় বলে প্রাণ থাকে। মেশিনের মত। কিন্তু পুরোটা তাও নয়। উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া প্রাণের একটি বৈশিষ্ট্য হতে পারে। কিন্তু সবক্ষেত্রে নয়। কোমায় চলে যাওয়া ব্যক্তি (গ্লাসগো কোমা স্কোর খুব কম হলে) উত্তেজনায় সাড়া নাও দিতে পারে, কিন্তু তবু শারীরবৃত্তীয় কার্য চললে তাকে মৃত বলা যায় না। প্রাণের আরও একটি ধর্ম হল চেতনা অর্থাৎ নিজের মস্তিষ্ক তথা শরীরের মাধ্যমে নিজেকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা, নিজের অস্তিত্বকে বোঝা। কিন্তু সেটাও সর্বৈব নয়। ঘুমন্ত প্রাণীর (যে স্বপ্ন দেখছে না) চেতনা থাকে না, কিন্তু শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী চলায় তাকে মৃত বলা যায় না। আবার, স্পঞ্জের মত প্রাণী উচ্চ চেতনাসম্পন্ন নয়। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে প্রাণকে সংজ্ঞায়িত করা কত ঝামেলার ব্যাপার! প্রাণ নিছক মেশিনের সচলতার মত নয়, আবার ক্ষেত্রবিশেষে তাই-ও।

(৭) এবার অনুভূতি বা চেতনার প্রশ্নে আসি। প্রথমে সৌপর্ণ অধিকারীর এই লেখাটি পড়ে দেখা যেতে পারে।
https://www.facebook.com/groups/2000118743332714/permalink/3678177875526784
সব অনুভূতির প্রমাণ সম্ভব নয়। অন্ধকে যতই বোঝানো হোক হাতি এইরকম চোখে না দেখলে হাতির ধারণা করা সম্ভব নয়। যে কোনওদিন রসগোল্লা খায়নি তাকে হাজার যুক্তি বিবৃতি দিয়েও বোঝানো সম্ভব নয় যে ওটার স্বাদ ঠিক কিরকম। যার কোনও দিন হাত পা কাটেনি তাকে ব্যাথা বোঝানো সম্ভব নয়, কারণ ব্যাথা মেসারমেন্টের না আছে কোনও যন্ত্র, না আছে কোনও ইউনিট (ডেল ইউনিট বাতিল হয়ে গেছে)। মানুষের ও অন্যান্য প্রাণীর জাগ্রত অবস্থা (চেতনা) নিয়ন্ত্রণ বা প্রমোট করে ওরেক্সিন বা হাইপোক্রেটিন নামক নিউরোপেপটাইড [short chains of amino acids linked by peptide (amide) bonds]। মানুষের মস্তিষ্কে প্রায় ১০০০০-২০০০০ ওরেক্সিন উৎপাদনকারী নিউরোন বা স্নায়ুকোষ থাকে। ভিন্ন ভিন্ন খাঁচায় (শারীরিক কাঠামোয়) গ্র্যাজুয়ালি ভিন্ন ভিন্ন চেতনার জন্ম হয়। গ্র্যাজুয়াল কেন? কারণ ঠিক কবে থেকে আমরা আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব বুঝতে পারি তা আমাদের নিজেদেরই অজানা। মোটামুটিভাবে যেটুকু বলা যায় তা নিচের লিঙ্কে পড়ে দেখা যেতে পারে।
https://www.scientificamerican.com/article/when-does-consciousness-arise/
এখন সমস্যা হচ্ছে কেন ওরিক্সিন চেতনার জন্ম দেয় বা একজনকে তার 'আমিত্ব' বুঝতে সাহায্য করে তা খুব একটা পরিষ্কার নয়। আমি আমার খাঁচায় শুধু 'আমিত্ব' অনুভব করি। যখন ঘুমাই (স্বপ্ন না দেখা অবস্থায়) বা অচেতন থাকি, তখন আমার খাঁচায় আমি কোনও 'আমিত্ব' উপলব্ধি করতে পারি না। যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হই, তখন আবার আমি আমার খাঁচায় 'আমিত্ব' উপলব্ধি করি, কিন্তু অন্যের খাঁচায় করি না। প্রতিটা খাঁচার 'আমিত্ব' চেতনা হলেও তারা স্বকীয় এবং ভিন্ন/আলাদা-আলাদা। সুতরাং জাগ্রত

অবস্থার 'আমিত্ব' নিছক ওরিক্সিন কেন্দ্রিক চেতনার চাইতেও বেশি কিছু যা একই খাঁচায় বারংবার জাগ্রত হতে পারে, কিন্তু অন্য খাঁচায় ট্রান্সফার হতে পারে না।

সমস্যার জায়গা মূলতঃ দু'টো। প্রথমত, জড় পদার্থ থেকে প্রাণের আবির্ভাব, ব্যাপারটা অদ্ভুত। এই একই কাজ ল্যাবরেটরিতে একদম স্ক্র্যাচ থেকে করা যাচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, শারীরিক গঠন এবং শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলী চেতনা তথা আমিত্বের জন্ম দিলেও আমিত্ব ব্যাপারটাই স্বকীয়। আমার 'আমিত্ব' অন্য খাঁচাতেও উপলব্ধি করতে পারতাম। কিন্তু কেন তা আমার খাঁচায়ই, অন্য খাঁচায় নয়, তা অজানা। অর্থাৎ, সহজ কথায় কেন আমি অন্য কেউ নই, তা অজ্ঞাত। শারীরিক গঠন ও শারীরবৃত্তীয় কার্যাবলীর বিভিন্নতা ভিন্ন ভিন্ন চেতনা তথা আমিত্বের জন্ম দেয় কিনা উইল রিমেইন আননোন ফরএভার।

উপসংহার:

(১) অনেক মানুষের বক্তব্য বিজ্ঞান তো অনেক সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। তাহলে কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হবে! না, এরকম কেউ মাথার দিব্যি দেয় নি যে 'ঈশ্বর' নামক বড়বাবুর অস্তিত্ব তাই বলে স্বীকার করতে হবে। কেউ যদি তাকে 'প্রকৃতি' বলে খুশি হন, হোন না, কে বারণ করেছে! কিন্তু এক্ষেত্রে কিছু বক্তব্য আছে। বিজ্ঞান অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারে না তো ঠিকই, ইন ফ্যাক্ট বেশির ভাগ সমস্যারই সমাধান করতে পারে না। এদের মধ্যে হয়তো কিছু সমস্যার সমাধান ভবিষ্যতে হবে, কোনও সমস্যার সমাধান হয়তো কোনও দিনই হবে না। কিন্ত এই সমস্যাগুলোর মধ্যেও চরিত্রগত দিক আছে। অধিকাংশ সমস্যারই মূল কারণ পরিমাপজনিত সমস্যা বা যথাযথ মডেল ডেভেলপমেন্টের অসুবিধা। বস্তুত এগুলো কোনও ফান্ডামেন্টাল প্রবলেম আদৌ নয়। কিন্তু আমরা আমাদের যত জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোর চেষ্টা করব তত দেখব যে আমরা আসলে ফান্ডামেন্টালি প্রায় কিছুই জানি না, কিচ্ছুটি না।

শক্তির সংজ্ঞা আমাদের অজানা, মহাকর্ষের প্রকৃতি আমাদের অজানা, সবচেয়ে বড় কথা কেন স্থান আদৌ আছে (নাও তো থাকতে পারত, স্পেসটাইমের অস্তিত্বই না থাকতে পারত) বা কেন সময় একইদিকে ধাবিত হয় (অন্যভাবে বিশ্বব্রহ্মান্ড শুরুর ক্ষেত্রে এনট্রপি কেন ভীষণ কম ছিল) এই বেসিক প্রশ্নগুলোর উত্তরই আমাদের অজানা। একটা সফটওয়ার কিভাবে বানানো হয়েছে সেটা না জেনে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করা যেরকম ব্যাপার এটা খানিকটা তেমনই। এর মানে বিজ্ঞানীদের আমি সমালোচনা করছিনা, তাঁদের প্রচেষ্টাকে সর্বদাই কুর্নিশ। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে নাস্তিক বিজ্ঞানী যেমন আছেন, অজ্ঞেয়বাদী বিজ্ঞানীর সংখ্যাও প্রচুর। স্বয়ং আইনস্টাইন অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন।

মূল কথা এটাই যে এই ফান্ডামেন্টাল ইগনোরেন্স (যা কোনোদিনই জানা সম্ভব নয়, almost infeasible) আর পাঁচটা বিজ্ঞানের না জানার মত নয়। তাই এমন কিছু চিরকাল থাকবে যা সবসময়ই মানুষের মনে শুধু বিস্ময়েরই সৃষ্টি করবে না, অকল্পনীয়ই থাকবে।

(২) এখানে একটা কথা বলা দরকার। পাশ্চাত্যের অধিকাংশ বিজ্ঞানীই কিন্তু ধর্ম এবং ঈশ্বরচেতনাকে এক ও অভিন্ন দেখেন। তাই তাঁদের কাছে অজ্ঞেয়বাদ নাস্তিকতার অনেক নিকট। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা আস্তিকতা এবং ধর্মের গালগল্পকে অস্বীকার করবেন। যেহেতু আস্তিকতা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত তাই সেটাকেও অস্বীকার করবেন। কিন্তু আমাদের দেশের বিশিষ্ট পদার্থবিদ ও বিজ্ঞানী ডঃ মণি ভৌমিকের মত মানুষেরা ঈশ্বরচেতনা ও ধর্মকে আলাদা করতে পারেন। কিছু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীও পারেন। সামাজিকভাবে বা কমিউনিটিগত ভাবে অবশ্যই এর কোনও মানে হয় না, কারণ সামাজিক ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও ধর্ম একে অপরের পরিপূরক। কিন্তু ইন্ডিভিডুয়ালি তার মানে আছে বৈকি। এরকম মানুষ খুব কম সংখ্যায় হলেও সমাজে আছেন যাঁরা মনে করেন ঈশ্বরচেতনা ও ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক, ঈশ্বরচেতনাকে কাজে লাগিয়ে ধর্ম নামক ভণ্ডামির উৎপত্তি হয়েছে। এই দলে নোবেলজয়ী পদার্থবিদ আরনো এলান পেনসিয়াস থেকে শুরু করে হার্ভার্ড মেডিসিন স্কুল ও জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির নোবেলজয়ী রসায়নবিদ ক্রিস্টিয়ান এনফিনসেনের মত বহু বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আছেন। এনফিনসেনের একটি বিখ্যাত উক্তি ছিল:

"I think that only an idiot can be an atheist! We must admit that there exists an incomprehensible power or force with limitless foresight and knowledge that started the whole universe going in the first place."

আমার ব্যক্তিগত মতামত আস্তিকতা ও নাস্তিকতা উভয়ই গোলমেলে। অজ্ঞেয়বাদ সুবিধাবাদী বা ডিপ্লোম্যাটিক হলেও অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য তার স্ট্রং স্টেটমেন্টের জন্য। অজ্ঞেয়বাদের বক্তব্য খুব সিম্পল-"We don't know and probably will never know how and WHY existence had come into existence in the first place. We don't know why 'I am ME'. Hence, mystery will remain forever." এবার এই রহস্যময়তাকে (যা আর পাঁচটা সাধারণ বিজ্ঞানের অজানার মত নয়) কেন্দ্র করে ঈশ্বর, প্রকৃতি, ভূতপ্রেত, ব্রহ্মদৈত্য যে যা খুশি বিতর্ক চালিয়ে যেতে পারেন।

আমি বিজ্ঞান ভালোবাসতাম। নক্ষত্র ও প্রকৃতি ভালোবাসতাম। তারপরেও মানুষকে ভালোবাসতাম এটা না জেনেই যে মানুষ বহুকাল থেকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন। আমাদের অনুভবগুলি অন্যের থেকে ধার নেওয়া। আমাদের ভালোবাসাও মেকি। আমদের বিশ্বাসগুলিতে রং মেশানো। আমাদের নিজস্বতার প্রমাণ কৃত্রিম শিল্পকলায়। ঘা না খেয়ে ভালোবেসে যাওয়া সত্যিই খুব কঠিন হয়ে গেছে

- রোহিত ভেমুলা।

রবীন্দ্রনাথ – নাস্তিকতা ও উগ্রবাদের যুগে গোরা

-পার্থপ্রতিম পাল

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে,পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে,আচার লইয়া বিচার নাহি কো জানে,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধ্বজা, দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

বিখ্যাত ‘ধর্মমোহ’ কবিতাটি যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, তখন ভারতীয় সমাজ যেসব দুষ্টক্ষতে জর্জরিত ছিল, তার অন্যতম ছিল ধর্মাশ্রিত সাম্প্রদায়িকতা তথা ধর্মীয় উগ্রবাদ। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ একজন সমাজবিজ্ঞানীর মতো ভেবেছেন। গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, প্রবন্ধে, নাটকে অসংখ্যবার উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন, সমস্যা চিহ্নিত করেছেন, সমাধানের উপায়ও নির্দেশ করেছেন। ১৯১০ সালে রচিত 'গোরা' উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সংঘটিত ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন, সামাজিক অধিকার, দেশপ্রেম ও নারীমুক্তি ফুটিয়ে তুলেছেন বলিষ্ঠ কলমে।
‘গোরা’ উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরার সঙ্গে অন্য চরিত্রগুলোর প্রাণবন্ত বিতর্কে, সত্যের বিভিন্ন রূপ প্রকাশিত হয়েছে।

"এক বৃদ্ধ মুসলমান মাথায় এক-ঝাঁকা ফল সবজি, রুটি, মাখন প্রভৃতি খাবার নিয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন।
এমন সময় এক ধনী ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে তার সামনে এসে পড়ে। বৃদ্ধ প্রাণে বেঁচে যায়, কিন্তু তার বহন করা খাবার রাস্তায় পড়ে নষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, সেই ধনী ব্যক্তি তাকে গালিগালাজ করতে করতে চাবুক মেরে তাকে রক্তাক্ত করে। গোরা সেই অসহায় বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে - কেন সে অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি। বৃদ্ধ বলে যে - দোষীকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। গোরা জবাবে বলে - যে অন্যায় সহ্য করে সেও দোষী। কেননা, সে জগতে অন্যায়ের সৃষ্টি করে। আমার কথা বুঝবে না, তবু মনে রেখো ভালোমানুষি ধর্ম নয়, তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে, তোমাদের মহম্মদ সে কথা বুঝতেন তাই তিনি ভালোমানুষ সেজে ধর্মপ্রচার করেননি।"

পুরো উপন্যাসে গোরার শারীরিক ও মানসিক জোরের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।
এ জোর সবসময় যুক্তির নয়, কখনও কখনও জোরের যুক্তিও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
কিন্তু যে কারণে গোরার অসাধারণত্ব কারও দৃষ্টি এড়ায় না তা হচ্ছে তার নিখাদ দেশপ্রেম। এই গুণ থেকেই সে শোষিত, নিপীড়িতের পক্ষে অবস্থান নিয়ে কারাবরণ করে। ভারতবর্ষ আর হিন্দুত্ববাদ সমার্থক - এমন যুক্তিবর্জিত দার্শনিকতা নিয়ে জীবনের মূল্যবান সময় অপচয় করে গোরা। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মেলামেশার অভিজ্ঞতা, তাকে নতুন সত্যের মুখোমুখি করে।
অত্যাচারী হিন্দু নয়, অত্যচারিত মুসলমানকে সে আত্মীয় মনে করে - ‘পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কী ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে যে, আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে।’

যেই জাতিভেদকে সস্নেহে মনের মধ্যে এতকাল লালন করে এসেছে গোরা, মা আনন্দময়ীর ঘরে সে খেতে চায়নি খ্রিস্টান দাসী লছমিয়া সেখানে থাকে বলে! আনন্দময়ীর ঔদার্যকে কখনও মেনে নিতে পারেনি সে।
কিন্তু গোরার জন্মরহস্যের উন্মোচন, তার অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করে। আনন্দময়ীকে সে বলে, "মা, তুমিই আমার মা! যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই - শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা! তুমিই আমার ভারতবর্ষ.....!" এটুকু বলেই গোরা ক্ষান্ত হয়নি, সেই দাসী লছমিয়ার হাতে জল খেতে চেয়েছে। এভাবে শুধু সাম্প্রদায়িকতা নয়, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও স্বাজাত্যবোধের মূলেও আঘাত হেনেছে গোরা।
‘সবার উপরে মানুষ সত্য’- এই অনন্য উপলব্ধিতে চিরভাস্বর গোরা।

নাস্তিক সেও পায়ে বিধাতার বর,ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর। শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো, শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় 'নাস্তিকতা' শব্দটার উচ্চারণ থেকে, অনেকেই চিন্তায়-ধর্মানুভূতিতে হয়তো বা পীড়িত হলেন, হয়তো বা আঁতকে উঠলেন! বাস্তবক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ঈশ্বর অনুভূতিতে মানবিক প্রাধান্য স্পষ্ট করেছেন - তাঁর কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, এমন কি তার প্রবন্ধগুলিতেও। আসলে রবীন্দ্রনাথ স্বর্গের চাইতেও, মর্ত্যের আকর্ষণ ও গুনগান দিয়ে তার সৃষ্টি-সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ধর্ম কোনও মোহ নয়, বরং ধর্মমোহ থেকে তিনি মুক্তি চেয়েছিলেন।
তিনি বিশ্বাস করতেন, এই মুক্তি পথেই সমস্ত বৈষম্য ও মানব কল্যাণের সকল বিরোধীতার অবসান ঘটে। তিনি অনুভব করেছিলেন, আত্মার লক্ষণ হচ্ছে শুভবুদ্ধি, সে শুভবুদ্ধি সকলকে এক করতে পারে। ঘোরতর ধর্মবিশ্বাসীর সংকীর্ণতা, সমাজের ক্ষতির কারন, তাদের চিন্তা শুভবুদ্ধি ও মুক্তবুদ্ধির পরিপন্থি।
তাদের বিশ্বাসের প্রাচীরের গায়ে সঠিক আঘাত হানতে পারলে, তাদের ধর্মান্ধতার চূর্ণ-বিচূর্ণ চিন্তা প্রকাশিত হয় - যা দিয়ে আমাদের মূঢ়, অন্ধ ও অশিক্ষিত দেশের মঙ্গল উৎপাদিত হয়। জ্ঞানের আলো, বিজ্ঞানের প্রভা এমনি করে হয়তো বা বিকশিত হয়।
তাই তিনি ধর্ম থেকে বিমুক্ত মানুষকে, স্বচ্ছ মুক্তমনের মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেছেন -
"হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।
যে পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে —
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।"

রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদের কবি। মানুষের হিংসা বিদ্বেষের উন্মেষ, যে ধর্মের কারনে হয়ে তাকে তিনি ঘৃণা করতেন মনে প্রাণে। তিনি মনে করতেন এবং সঠিকভাবেই মনে করতেন, ধর্ম মানুষের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির হাতিয়ার। মানুষের মর্যাদাকে, মানুষের সাম্যবোধকে তিনি আপনার সত্তার গভীরে স্থান দিয়েছিলেন বলে - শাস্ত্র মানা, ধার্মিকদেরকে কূপমণ্ডুকপণার প্রশয় দেন নি।

তাই তিনি নাস্তিকতার মহত্ত্বকে প্রকাশ করলেন 'চতুরঙ্গ'র জ্যাঠামশাই ও 'রবিবার'র অভীক চরিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। ভগবতসত্তার অস্তিত্ব স্বীকার না করেও মানুষ যে কত বড়ো হতে পারে, তা তো তাঁর জ্যাঠামশাই চরিত্রে তার প্রমান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় সাহিত্যে শিল্পকলায় চিঠিপত্রে বারবার মানুষের কথা বলেছেন, 'খুজি নরদেবতারে, তাঁর মূল দর্শন'। তিনি তাঁর একটি চিঠিতে লিখেছেন, 'আমার ঠাকুর মন্দিরেও নয়, প্রতিমাতেও নয়, বৈকুণ্ঠেও নয়, আমার ঠাকুর মানুষের মধ্যে - সেখানে ক্ষুধা তৃষ্ণা সত্য, পিত্তিও পড়ে, ঘুমেরও দরকার আছে - যে দেবতা স্বর্গের, তার মধ্যে এসব কিছুই সত্য নয়।' (চিঠিপত্র : ৯- ১৪ই জুন, ১৯৩১) অন্য একটি চিঠিতে তিনি নাস্তিকদের প্রসঙ্গে বলেছেন, "কত লোক দেখেছি যারা নিজেকে নাস্তিক বলেই কল্পনা করে, অথচ সর্বজনের উদ্দেশ্যে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করচে।
এও প্রায়ই দেখা যায় যারা নিজেকে ধার্মিক বলেই মনে করে তারা সর্বজনের সেবায় পরম কৃপণ, মানুষকে তারা নানা উপলক্ষ্যেই পীড়িত ও বঞ্চিত করে। বিশ্বকর্মার সঙ্গে কর্মেল মিল আছে, মহান আত্মার সঙ্গে আত্মার যোগ আছে কত নাস্তিকের, তাদের সত্য পূজা জ্ঞানে, ভাবে, কর্ম্মে, কত বিচিত্র কীর্ত্তিতে জগতে নিত্য হয়ে গেছে, তাদের নৈবেদ্যের ডালি কোনদিন রিক্ত হবে না।" (চিঠিপত্র-৯, ২৩শে জুন) রবীন্দ্রনাথ একই চিঠিতে বলেছেন, "মানুষকে অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা, আরোগ্য, শক্তি সাহস দিতে হবে - এই সাধনায় যারা আত্ম নিবেদন করেছে, তারা কোনো দেবতাকে বিশেষ সংজ্ঞাদ্বারা মানুক বা না মানুক, তারা সেই বেদ্য পুরুষকে জেনেছে, সেই মহান আত্মাকে, সেই বিশ্বকর্মাকে, যাঁকে জানলে মৃত্যুর অতীত পাওয়া যায়"। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন নাস্তিকেরা আচার-বিচার, সংস্কার, এমন কি দৈব অস্তিত্বের ধারণা, কোনো কিছুর পায়েই তারা নিজেদের বলি দেননি। তাই তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, "দেশ-বিদেশের সেইসব নাস্তিক ভক্তদের আমি আপন ধর্ম্মভাই বলেই জানি"। আমরা দেখেছি, কবি ধর্ম নিয়ে যত ভাবনার গভীরে গেছেন, সেখানে তিনি অসার বস্তু পেয়েছেন, তাই তার মনের মধ্যে - ধর্ম নয় মানব সভ্যতা, মানুষের কল্যাণবোধ কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রীয় ধর্মকে পরিহার করে, মানবধর্মকে উচ্চে স্থান দিয়েছেন। নাস্তিকেরাও মানুষের ধর্মকে বেশি মুল্য দিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ গৌতম বুদ্ধের ধর্মকে মানবতাবাদের ধর্ম হিসেবে মুল্যায়ন করেছেন। যেহেতু "Buddha did not claim to be a God, not did he warmed any specific revelations from a God on height." রবীন্দ্রনাথের মুল বাণী হলো, শেষ পর্যণত মানব ঐক্য হবে আধ্যাত্মিক এবং রেশনাল। এই আধ্যাত্মিক অর্থ ঐশ্বরিক জীবনচর্চা নয়, মানব সভ্যতার ও মানবমৈত্রীর চর্চা নাস্তিক যে সৎ, প্রবঞ্চক নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে গল্পে তা বিধৃত করেছেন, চতুরঙ্গ উপন্যাসে জগমোহনকে আদর্শহীন নাস্তিক না করে মানবকল্যানমুখী করে গড়ে তুলেছেন তিনি। তাই তিনি বলেছেন, 'জগমোহনের নাস্তিক ধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভাল করা।' জগমোহন যখন বলেন 'কোনো গরজ নাই সেইটে আমার সবচেয়ে বড় গরজ।
' নাস্তিক ধর্মের ইস্তেহার রচনা করে শচীশকে জগমোহন বললেন, "আমরা নাস্তিক, সেই গুমরেই আমাদিগকে একেবারে নিষ্কলক নির্মল হইতে হইবে। আমরা কিছুই মানি না বলিয়াই আমাদের নিজেদের জোর বেশি।
" ধর্ম ধারকেরা তো কোনো যুক্তির ধার ধারেন না।
তাঁদের যুক্তি হলো 'বিশ্বাসে মিলায় ধর্ম তর্কে বহু দুর।'

নাস্তিকদের সম্পর্কে রবীন্দ্রবোধ যে কত উচ্চস্থানে, তার অসংখ্যা প্রমাণ আছে তাঁর উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাশিয়া ভ্রমণকালে রাশিয়ার নতুন ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে নিন্দুকের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'অন্য দেশের ধার্মিকেরা ওদের যত নিন্দাই করুক আমি নিন্দা করতে পারবো না।
' সেইখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'লোকের অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে, মুঢ়তাকে বাহন করে যে ধর্ম মানুষের চিত্তের স্বাধীণতা নষ্ট করে, সেই ধর্ম রাজশক্তির সকল অনাচারের সহায়। সে বিষকণ্যার মতো, আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে সে মারে।' তিনি বলেছেন, "ধর্ম মোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।" তিনি নাস্তিকতার প্রশংসা করে বলেছেন, "যুরোপে এমন অনেক নাস্তিক আছেন, যাঁরা বিশ্বমানবের উপলব্ধির দ্বারা তাঁদের কর্মকে মহৎ করে তোলেন, তাঁরা দূর কালের জন্য প্রাণপণ করেন, সর্ব্বদেশের জন্যে।
তাঁরাই যথার্থ ভক্ত।"

বর্তমান ভারতবর্ষে উগ্র ধর্মাশ্রিত সাম্প্রদায়িকতা যেভাবে মৌলবাদিদের উৎসাহে, সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিদ্বেষের বিষবৃক্ষের বিজ ক্রমশ মহিরুহের আকার ধারণ করে, আকাশে বিষ-বায়ু ছড়াচ্ছে - তার মহার্ঘ্য ওষুধ ‘গোরা’ উপন্যাসের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন।
যে হিন্দুত্বের অহংকারে গোরা গরিয়ান ছিল, একদিন জানতে পারল সে হিন্দুই নয়, সে এক আইরিশ দম্পতির সন্তান। নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরেশবাবুকে গোরা বলেছিল, "আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই, যার মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না, যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন - যিনি ভারতবর্ষের দেবতা......."

মহৎ ব্যক্তিরা সব সময় ভয়ানক বাধার সম্মুখীন হয় সংকীর্ণ চিন্তার মানুষদের কাছে থেকে।

- অ্যালবার্ট আইনস্টাইন

দেখুন ইসরাইল কেন এত শক্তিশালী ?

-পার্থপ্রতিম পাল

পৃথিবীতে ইহুদীদের মোট সংখ্যা দেড় কোটির মত।
একটি মাত্র ইহুদী রাষ্ট্র – ইসরাইল।
ইসরাইলে ইহুদীর সংখ্যা ৫৪ লাখ, অবশিষ্ট প্রায় এক কোটি ইহুদী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

এর মধ্যে আমেরিকাতে ৭০ লাখ, কানাডাতে ৪ লাখ আর ব্রিটেনে ৩ লাখ ইহুদী থাকে।
ইহুদীরা মার্কিন জনসংখ্যার মাত্র ২%, আর পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.২%।
অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি ৫০০ জনে একজন ইহুদী!

কিন্তু জনসংখ্যার দিক দিয়ে ঢাকা শহরের কাছাকাছি হলেও বিশ্বে ইহুদি সম্প্রদায় থেকে যুগে যুগে বেরিয়ে এসেছে অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তি।

প্রধান ধর্মগুলোর পর পৃথিবীতে যে মতবাদটি সবচেয়ে বেশী প্রভাব ফেলেছে সেই কমিউনিজমের স্বপ্নদ্রষ্টা কার্ল মার্কস ইহুদি সম্প্রদায় থেকে এসেছেন।
বিশ্বের মানুষকে মুগ্ধ করে রাখা যাদু শিল্পি হুডিনি ও বর্তমানে ডেভিড কপারফিল্ড এসেছেন একই কমিউনিটি থেকে।
এসেছেন আলবার্ট আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানী, যাকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলা হয় আর প্রফেসর নোয়াম চমস্কি – র মত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক যাকে প্রদত্ত ডক্টরেটের সংখ্যা আশিটির ও বেশি।

এর অন্যতম কারণ সাধারণ আমেরিকানরা যেখানে হাইস্কুল পাশকেই যথেষ্ট মনে করে সেখানে আমেরিকান ইহুদীদের ৮৫% বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া।
আর আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমনঃ ওআইসি-র ৫৭টি দেশে বিশ্ববিদ্যালয় আছে পাঁচ হাজারের মত, আর এক আমেরিকাতেই বিশ্ববিদ্যালয় আছে প্রায় ছয় হাজার এর কাছাকাছি।

ওআইসি ভুক্ত দেশগুলোর একটা বিশ্ববিদ্যালয়ও যেখানে The World University Ranking সাইট এর প্রথম ১০০টা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পায়নি।
সেখানে প্রথম একশোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে আমেরিকার ৪৫টা বিশ্ববিদ্যালয়। (প্রথম দশটার মধ্যে সাতটা)

যেখানে প্রথম ২০০ র মধ্যে ওআইসি-ভুক্ত ৫৭ টি মুসলিম দেশের একটি মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে তুরস্কের Bogazici University (১৯৯ তম)
সেখানে আমেরিকার বিশ্বসেরা বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ২০% স্টুডেন্টস ইহুদী সম্প্রদায় থেকে আসা।

আমেরিকান নোবেল বিজয়ীদের মোটামুটি ৪০% ইহুদী অর্থাৎ নোবেল বিজয়ী প্রতি চার থেকে পাঁচ জনের একজন ইহুদী।
আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রফেসররা ইহুদী।
আমেরিকার উত্তর পূর্ব উপকূলের ১২টি
বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়কে এক সাথে আইভি লীগ বলা হয়।

২০০৯ সালের ১টি জরিপে দেখা গেছে আইভি লীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক'জন ভিসি-ই ইহুদী।
হতে পারে ইহুদীরা আমেরিকার মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশ, কিন্তু আমেরিকান রাজনীতিতে তাদের প্রভাব একচেটিয়া। আমেরিকার ১০০ জন সিনেটরের ১৩ জন ইহুদী।

এর চেয়ে ভয়ংকর তথ্য হল ইহুদীদের সমর্থন ব্যতীত কোন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হতে পারেনা, কোন প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেনা।
বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব যতখানি- আমেরিকান রাজনীতিতে ইহুদীদের প্রভাব তার চেয়েও অনেক অনেক বেশি।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নির্বাচনী ফাণ্ড বা তহবিল সংগ্রহ একটা বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। বারাক ওবামা বা ক্লিনটন নিজের টাকায় প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। ডোনেশান এবং পার্টির টাকায় তাদের নির্বাচনী ব্যয় মিটাতে হয়েছে। আর মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের সবচেয়ে বড় নির্বাচনী ফাণ্ড দাতা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে – AIPAC – America Israel Public Affairs Committee.

আমেরিকার এক্সপোর্ট ইমপোর্ট ব্যাংকসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকগুলো ইহুদীদের দখলে। ফলে আমেরিকার কেউ চাইলেও এদের কিছু করতে পারবে না। বরং জুইশ কমিউনিটি বা ইহুদি সম্প্রদাকে হাতে না-রাখলে ক্ষমতায় টেকা যাবে না।
এসব কারণে শুধু জুইশ কমিউনিটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ক্ষমতাসীন মার্কিন প্রেসিডেন্টে প্রশাসনের কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ করে যেতে হয়।

আমেরিকার রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করে মূলতঃ কর্পোরেট হাউজগুলো। তারা প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত বানাতে পারে, এবং প্রেসিডেন্টকে সরাতে পারে। এসব কর্পোরেট হাউজগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় এদের মালিক কিংবা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম্পানিগুলোর মূল দায়িত্বে থাকা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা চীফ এক্সজিকিউটিভ অফিসার, সিইও হলেন ইহুদী কমিউনিটির মানুষ।

এই কথা মাইক্রোসফটের ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি জাপানিজ কোম্পানি সনির আমেরিকান অফিসের জন্যও সত্য।

প্রায় অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ পদে জুইশ আমেরিকানরা কাজ করছেন। জুইশ কমিউনিটির ক্ষমতাধর বিলিয়নেয়াররা মিলিতভাবে যে-কোনো ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারেন।
মিডিয়া জগতে যদি আপনি তাকান তাহলে দেখবেন;
CNN, AOL, HBO, Cartoon Network, New line cinema, Warner Bross, Sports illustrated, People - Gerald Levin – ইহুদী মালিক নিয়ন্ত্রিত।

ABC, Disney Channel, ESPN, Touchstone pictures - Michael Eisner – ইহুদী মালিক নিয়ন্ত্রিত।

Fox Network, National Geographic, 20th century Fox Rupert Murdoch – ইহুদী মালিক নিয়ন্ত্রিত।

Top 4 famous Newspapers of USA & their editors
New York Times – Arthur Sulzberger
New York Post – Rupert Murdoch
Washington Post – K.M. Graham
Wall street journal – Robert Thomson
সব কয়টি খবরের কাগজ ই ইহুদী মালিক নিয়ন্ত্রিত।

আপনার প্রিয় মিডিয়া ফেসবুক প্রতিষ্ঠাতা Mark Zuckerberg পর্যন্ত একজন ইহুদী।

ইরাকের বিরুদ্ধে আমেরিকার আগ্রাসনকে সাধারণ আমেরিকানদের কাছে বৈধ হিসেবে চিত্রায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ফক্স নিউজ। বিশ্ববিখ্যাত মিডিয়া মুগলরুপার্ট মারডকের নিয়ন্ত্রণাধীন এরকম প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই জুইশদের সমর্থন দিয়ে এসেছে। রুপার্ট মারডকের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সারা বিশ্বের ১৮৫ টি পত্রপত্রিকা ও অসংখ্য টিভি চ্যানেল।

বলা হয় পৃথিবীর মোট তথ্য প্রবাহের ৬০% ই কোন ন কোনভাবে নিয়ন্ত্রণ করে রুপার্ট মারডকের The News Corporation. টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে এবিসি, স্পোর্টস চ্যানেল, ইএসপিএন, ইতিহাস বিষয়ক হিস্টৃ চ্যানেলসহ আমেরিকার প্রভাবশালী অধিকাংশ টিভি-ই ইহুদিরা নিয়ন্ত্রণ করছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে।
আমেরিকায় দৈনিক পত্রিকা বিক্রি হয় প্রতিদিন কমপক্ষে ৫৮ মিলিয়ন কপি।

“ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোর ডিএনএ কিংবা প্রোটিনের মতো কোন ভৌত রূপ হয়তো নেই, কিন্তু অন্য সকল ক্ষেত্রে এটা প্রকৃত ভাইরাসের মতোই কাজ করে।" (বিশ্বাসের ভাইরাস)”
— অভিজিৎ রায়, বিশ্বাসের ভাইরাস: বিশ্বাসের বিবর্তনীয় বিশ্লেষণ

নাগমণি কি সত্যিই আছে?

- পিন্টু হালদার

কথায় বলে, সাত রাজার ধন নাগমণি অর্থাৎ সাত জন রাজার ধন সম্পত্তি একত্রিত করলে নাগ মণির মূল্যের হবে। নাগমণির উল্লেখ পুরান এমনকি সিনেমাতেও পেয়েছি সেই থেকে আমাদের ধারণা যে নাগমণি থাকলেও থাকতে পারে! সেই নিয়ে দু চার কথা খোলসা করে বলার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলে রাখি নাগমণি মানুষের কল্পনা মাত্র অনেকটা স্পাইডার ম্যান বা এন্ডগেমের থানোস-এর ইনফিনিটি স্টোনের মতো যার বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই।

1. বলা হয় যে সাপ 100 থেকে 1000 বছর বাঁচবে সেই সাপ সাপেরদের রাজা হয়ে যাবে এবং মণি তার মাথায় ধারণ করবে :-

>কিন্তু কথা হলো সাপ ওতো দিন বাঁচে না। আলাদা আলাদা সাপের আয়ুষ্কাল আলাদা আলাদা! যেমন হেলে সাপ প্রায় 5 থেকে 6 বছর বাঁচে । দাঁড়াস, কেউটে, গোখরো বাঁচে প্রায় 11 থেকে 12 বছর। ভারতীয় অজগর বাঁচে 34 থেকে 35 বছর। তাই কোনো সাপই 100 বছর বা তার বেশি বাঁচে না তাই মণির ধারণা সম্পূর্ণ ভারতীয় কুসংস্কার!

2 .যে সাপ কোনো দিন কামড়ায় নি সেই সাপের বিষ জমে শক্ত হয়ে পাথর হয়েযায় আর বিষের জন্য ঝলমল করে:-

>বিষধর সাপ তার শিকার করতে তার বিষের প্রয়োগ করে। শিকার ছাড়া না খেয়ে সাপ বাঁচবে কি করে?

3. সাপ বুড়ো হয়ে গেলে নাগমনির আলোর সাহায্যে শিকার করে:-

>কিছু সাপ দিনে চলা ফেরা করে ও কিছু সাপ রাত্রে চলা ফেরা করে! যারা রাত্রে চলাফেরা করে সেই সাপেদের চোখ অনেকটা বিড়ালের চোখের মতো হয় যাতে অল্প আলোতেও দেখতে পায়। তাছাড়া সাপ যেহুতু চোখে ভালো দেখতে পায় না তাই জিভ ও রিসেপ্টর বা সংবেদনশীল অঙ্গ এর উপর ভরসা করে (কিভাবে জিভ ও সংবেদনশীল অঙ্গ দিয়ে সাপ বুঝতে পারে তা পরে আলোচনা করবো) তাই নাগমনির আলোর কোনো দরকার নেই সাপের।

4 . সে সাপের নাগমনি আছে তারা ইচ্ছাধারী হয়, মানে যা ইচ্ছে হতে পারবে:-

>এগুলো হিন্দি সিনেমা থেকে আমাদের মাথায় ঢুকেছে বাস্তবে কখনো হয় না। লেখক গুল্প রোমাঞ্চিত করার জন্য এরকম প্লট সৃষ্টি করেন। সেটা নিয়ে মজা না পেয়ে, মাথায় ঢুকিয়ে নিজের মস্তিষ্কে কুসংস্কারের সংক্রমণ ঘটানো বোকামি। বাস্তবে কোনো অস্তিত্ব নেই!

5. সাপুড়েরা চোখের সামনে সাপের মাথার থেকে মণি বের করে দেয়!আর তুমি বলছো কুসংস্কার?:-

>সাপুড়েরা সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ভাবে বোকা বানিয়ে টাকা লুট করে চম্পট দেয়! সাপের মাথার থেকে মণি বের করা টাও একটা ভেলকি সেটা হলো - একটা ফনাধর সাপ নিয়ে বিশেষ করে গোখরো! (আমরা ফনাধর সাপ দেখলে রোমাঞ্চিত হই কিনা! স্বয়ং শিব সেও গলায় রাখে এই সাপ কে!) যাক সে নিয়ে অন্যদিন বলা যাবে । আসল কথাতে ফিরে আসি! তো এই গোখরো

সাপ নিয়ে সাপটির লেজের উপরে ছোট্ট ফুটো করে সেখান থেকে কালো ,লাল চকচকে পাথর বা কাঁচের স্ফটিক ঢুকিয়ে দেয়। কিন্তু তাকে তো লেজে রাখলে হবে না আমাদের বিশ্বাস সেটা সাপের মাথায় থাকে! তাই সাপুড়েরা সেটাকে টিউবের মতো চেপে চেপে ঠেলতে ঠেলতে মাথায় নিয়ে আসে। (অনেকটা দাদুর আন্ডার প্যান্টের মতো যেভাবে সেফটি পিন দিয়ে দড়ি ঢোকানো হয় তেমনি)

এবার সাপুড়েরা অপেক্ষায় থাকে কাকে বোকা বানানো যায়! আপনার বাড়িতে সাপ টা ছেড়ে দিয়ে বলবে আমি একটা সাপের গন্ধ পাচ্ছি! মনে হয় খুব পুরনো সাপ মণি থাকতে পারে! ব্যাস আপনিও বললেন খুঁজুন খুঁজুন! সাপুড়েদের ওস্তাদ আপনাকে সাপের ভয়ংকর কথা বলে ব্যস্ত রাখছে অন্যদিকে তার চ্যালারা একটু মাটি নিয়ে এসে বললো ওস্তাদ দেখুন তো (সাপেদের গায়ে সব সময় গন্ধ থাকে না মেটিং সিজিনে ফেরোমনের কটু গন্ধ থাকে কিন্তু সেটা মাটি শুকে বলা যায় না! মাটি শুকে যদি বলে দিতেই পারতেন ওনারা তাহলে ওনাদের দিয়ে ল্যান্ড মাইন খোজানো হয় না কেন!) ওস্তাদ গন্ধ নিয়ে বিজ্ঞের মতো বললো এটা এটা গোখরো ,ফনিমনসা বা শীষ নাগ (যেটা আগে থেকেই ছেড়ে রেখে ছিল) ব্যাস সাপ টা ধরে আনা হলো । এই বার সে সাপেরমাথায় হাত দিয়ে বলবে এই অংশটা ফুলে আছে দেখুন মণি আছে! কেটে বের করে দিতে পারি 10000 বা 50000 টাকা লাগবে! (মুরগির বাড়ির সাইজের উপর ডিপেন্ড করে কতো টাকা চাইবে) আপনিও শুনেছেন সাত রাজার ধন সম্পতি একত্রিত করলে এই মণি সমান হয় আপনি কোটিপতি হয়ে যাবেন। ব্যাস সাপের মাথা কেটে একটা পাথর বের করা হলো (যেটা আগে থেকেই সাপুরেরা ঢুকিয়ে রেখেছিল) আপনিও আনন্দে গদগদ হয়ে টাকা দিয়ে কিনে নিলেন। আপনাকে বলা হলো এখন সদ্য বের করা হয়েছে তো তাই আলো বের হচ্ছে না পুজো দেবেন আস্তে আস্তে আলো হবে আর আপনার ধন সম্পত্তিও বাড়বে। এই বলে সাপুড়েও চম্পট দিলো !আর ,পরে আলোও বের হবে না আর আপনার সম্পত্তিও বাড়বে না এই মণি থেকে। আপনি আস্ত মুরগি বনে গেলেন!

একবার ঠান্ডা মাথায় ভাবুন তো যদি মণি বলে কোনো জিনিস থাকতো বা মণির এমন ক্ষমতা থাকতো তাহলে সাপুড়েরা আপনাকে বিক্রি করবে কেন? ওরা নিজেরাইতো ধন সম্পত্তির মালিক হয়ে যেত তাই না?

তারচেয়ে একটু জানার চেষ্টা করুন। কুসংস্কার গুলো মাথা থেকে টেনে ছুড়ে ফেলুন! চোখের সামনের সাপুড়েদের এই অমানবিক কার্যকলাপ দেখলে তাতে বাধাদিন। পুলিশে খবর দিন। সাপ পোষা, সাপ নিয়ে খেলা দেখানো, ধরা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এই প্রাণী গুলিকে বাঁচানো আমাদের দায়িত্ব।

সুতরাং সাপুড়ের কাছে নিজে মুরগি হওয়ার চেয়ে মুরগি কিনে খাওয়া ভালো!

ভাস্করাচার্য কোথাও পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাভাস (elliptical) পথে ভ্রমণ করিতেছে- এ কথা বলেন নাই। তিনি কোথাও প্রমাণ করেন নাই যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও গতিবিদ্যার নিয়ম প্রয়োগ করিলে পৃথিবীর এবং অপরাপর গ্রহের পরিভ্রমণ পথ নিরূপণ করা যায়। সুতরাং ভাস্করাচার্য বা কোনো হিন্দু, গ্রিক বা আরবি পণ্ডিত কেপলার, গ্যালিলিও বা নিউটনের বহু পূর্বেই মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এইরূপ উক্তি করা পাগলের প্রলাপ বই কিছু নয়।

-মেঘনাদ সাহা

বাচ্চা মানুষ করার এককুড়ি টিপস

-সৌম্যকান্তি পান্ডা (বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ)

১. শিশুর জন্মের পর প্রথম ৭-১০ দিনে জন্মের সময়ের ওজনের ৮-১০ শতাংশ ওজন কমে যায়। এটা একদম স্বাভাবিক। বিশেষত যে সব শিশু সঠিক সময়ের আগে (৩৭ গর্ভ-সপ্তাহের আগে) জন্মায় তাদের ক্ষেত্রে এই ওজন কমে যাওয়ার পরিমান বেশি হয়।

২. শিশুকে চড়া রোদের তলায় রাখবেন না। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি ত্বকের ক্ষতি করতে পারে।

৩. গর্ভাবস্থায় শরীরে প্রচুর জল জমে যায় ভেবে অনেকে মা'কে চড়া রোদে বসিয়ে আর জল কম খেতে দিয়ে শোকানোর চেষ্টা করেন। এটা করবেন না। জলের অভাবে বুকের দুধের পরিমান কমে যেতে পারে।

৪. নবজাতক মধু খেয়ে মিষ্টভাষী হয় না। বরং এতে পেটে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে।

৫. পেচ্ছাব করার আগে কান্না মানেই মূত্রনালীর সংক্রমণ নয়। মূত্রথলি ভর্তি হয়ে গেলে বাচ্চা অস্বস্তির কারনে কাঁদতে পারে। পেচ্ছাব হয়ে গেলে এই কান্না ঠিক হয়ে যায়। পেচ্ছাব হওয়ার সময় কান্না নিয়ে বরং চিন্তা থাকে। বুঝতে না পারলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৬. শিশুকে জন্মের কয়েক ঘন্টা পর থেকেই তেল মাখানো যেতে পারে। কম ওজনের অপরিনত বাচ্চার ঠান্ডা হয়ে যাওয়া আটকাতে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা নিতে পারে। সুগন্ধীবিহীন নারকেল তেল দিয়েই হাল্কা মালিশ করতে পারেন।

৭. সরষের তেল মাখানো যাবে না। সরষের তেল রান্না করা-মাছ ভাজার জন্য। বাচ্চাকে মাখানোর জন্য নয়। "সরষের তেল দিয়ে বাচ্চার ঠান্ডা কম লাগে আর নারকেল তেল দিলে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শুরু হয়ে যায়"--ভুল ধারনা। বরং সরষের তেলের ইরিট্যান্ট থেকে বাচ্চার র‍্যাশ বেরোতে পারে।

৮. নাভীর নাড়ি খসে না পড়া অব্দি স্পঞ্জিং করুন।জন্মের ২৪ ঘন্টা পর থেকেই স্পঞ্জিং শুরু করা যায়। নাড়ি খসে গেলে স্নান করান। প্রথমে ২-৩ দিন ছাড়া করালেও ক্ষতি নেই। মাথায় সবার শেষে জল লাগাবেন।মুছে ফেলবেন সবার আগে। ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ভয়ে স্নান বন্ধ করবেন না। অপরিষ্কার ত্বকে সংক্রমণ হতে পারে।

৯. পাউডার জাতীয় কিছু দেবেন না। বোরিক অ্যাসিড মেশানো কোনও কসমেটিকস দেওয়া নৈব নৈব চ। কাজল দেবেন না। চোখে তো নয়ই, মুখের কোথাওই দেওয়া ঠিক নয়। কাজল দিয়ে সব 'নজর' আটকে গেলে এত খরচ করে হাসপাতাল বানানোর দরকার পড়ত না।

১০. প্রথম ছ'মাসে শুধুই বুকের দুধ। 'পেট ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে,বাচ্চা খিদেয় শুকিয়ে যাচ্ছে, বুকে দুধ নেই' এগুলো অধিকাংশ সময় ভুল ধারনা। যে বাচ্চা দিনে ন্যূনতম ৬-৭ বার পেচ্ছাব করছে, দুধ খেয়ে ২-৩ ঘন্টা ঘুমোচ্ছে এবং ওজন বাড়ছে, তার বুকের দুধের খেতে সমস্যা হচ্ছে না। ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বাইরের দুধ দেওয়া যাবে না।

১১. দুধ তোলা মানেই বমি নয়। সুস্থ স্বাভাবিক বাচ্চাও সারাদিনে ৮-১০ বার বা তারও বেশিবার দুধ তুলতে পারে। ওজন ঠিক থাকলে এবং অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা না থাকলে দুধ তোলা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই। প্রত্যেকবার দুধ খাওয়ার পরে ঢেকুর তোলান, মাথার দিক উঁচু করে শোওয়ান। বমির সাথে তফাত করতে না পারলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন বলাই বাহুল্য।

১২. দুধ খাওয়ার পরে পরেই অল্প অল্প করে সারাদিনে ১৫-২০ বার পায়খানা করাও অস্বাভাবিক নয়। এটা অনেকটা রাস্তার ট্রাফিকের মত। পাকস্থলীতে খাবার এলেই সংকেত যায় রাস্তা পরিষ্কার করার। ফলস্বরূপ বৃহদন্ত্রের মধ্যে জমে থাকা মল বেরিয়ে যায়।

১৩. এবং গ্যাস! মাথায়ও ওঠে না, হাঁটুতেও নামে না।

১৪. দুগ্ধপোষ্য শিশুর অর্ধতরল পায়খানা লিভারের দোষে নয়। লিভার টনিক খাইয়ে লিভারকে শক্তিশালী করে ডাম্বেল তোলার উপযুক্ত করা যাবে ভাবলে ভুল করছেন।

১৫. সামান্য কয়েকটি গুরুতর অসুখ ছাড়া বুকের দুধ কখনোই বন্ধ করার দরকার হয় না। মায়ের সামান্য জ্বর-সর্দি-কাশি এসবের জন্য তো নয়ই।

১৬. এক বছর বয়সের আগে গরুর দুধ না দেওয়াই ভালো। বাজারচলতি প্যাকেটের গুঁড়ো খাইয়ে টলার-স্ট্রংগার-শার্পার করা যায় না। মাথায় রাখুন, রবি ঠাকুর আর আইনস্টাইনের সময় এগুলো বাজারে ছিল না।

১৭. কলা বা টক জাতীয় ফল খেয়ে ঠান্ডা লাগে না। বরং তার মধ্যে থাকা প্রচুর পরিমান খনিজ পদার্থ, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

১৮. মোটা হওয়া মানে স্বাস্থ্য হওয়া নয়। মুটিয়ে যাওয়া কিংবা হাড় জিরজিরে হয়ে যাওয়া দুটিই অস্বাস্থ্য। দুনিয়ার যাবতীয় ফাস্ট ফুড আর প্যাকেটের খাওয়ার খাইয়ে শিশুকে জ্যান্ত ফুটবল বানাবেন না।

১৯. এক বছর বয়েসের পর স্বাভাবিকভাবেই শিশুর বৃদ্ধিহার কমে আসে। ওজন বাড়ছে না ভেবে জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করবেন না। এতে শিশুটি খাবার দেখেই আতঙ্কিত হয়ে পড়তে পারে।

২০. নিয়ম মেনে ভ্যাকসিন দিন। নিজে নিজে বা পাড়ার কোয়াকের পরামর্শে মুড়ি মুড়কির মত অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়াবেন না। মনে করিয়ে দিই, শুধু ভারতে বছরে ৫৮০০০ শিশু অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধী ব্যাক্টিরিয়ার আক্রমণে মারা যায়। শিশুকে যত্ন করা মানে সারাদিন আঁচলে ঢেকে রাখা নয়। দুবার আছাড় খাক, তিনবার হাঁটু ছড়ুক, ধুলোমাটি একটু ঘাঁটুক.. প্রকৃতির সাথে বেড়ে ওঠাটাও একটা শিক্ষা।

https://thedoctorsdialogue.com/few-tips-of-child-parenting/

ওয়ার্ল্ড সিজোফ্রেনিক ডে

-আদিত্য

প্রতিবছর মে মাসের ২৪ তারিখে World Schizophrenia Day পালিত হয়। WHO এর মতে এখনও গোটা পৃথিবীতে প্রায় ২১ মিলিয়ন লোক এই সিজোফ্রেনিয়াতে আক্রান্ত! মোটামুটি বিংশ-শতাব্দীর একটু আগে থেকে সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে কাজ শুরু হয়। ১৯৮৬ সালে প্রথম সিজোফ্রেনিয়া সচেতনতা দিবস পালিত হয়, মে মাসের ২০ থেকে ২৭!এইভাবে সিজোফ্রেনিয়া দিবস পালনের প্রধান কারণ হল- সাধারন মানুষকে সচেতন করা।Schizophrenia এর সিম্পটোমগুলোর সাথে সাধারন মানুষদের পরিচয় করানো। চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা ও প্রাপ্যতা, সহজলভ্যতা নিয়ে প্রচার করা! এই রোগ হলে তার পরিণতি কি হতে পারে ও কতো ভাগ সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা তা বোঝানো।এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Schizophrenia নিয়ে স্টিগমা এবং বৈষম্য বন্ধ করা।

Schizophrenia একটি মানসিক সমস্যা যা মূলত এটা একটা মস্তিষ্কের আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ গন্ডগোল হলে তৈরি হয় (Brain Disorder)! Dr. Eugen Bleuler এই Schizophrenia শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

Schizophrenia কে গোদা ভাবে ট্রান্সলেট করলে হয়- Splitting of the mind. গ্রিক শব্দ 'schizein' (to split) আর 'phren' (mind) থেকে যার উৎপত্তি! তাই পপুলার কালচারে Schizophrenia মানে কিন্তু 'Split Personality' কে বোঝায় যা একেবারে ভুল!

এখানে Split মানে আমাদের মনের অনুভুতি(Emotion), চিন্তনের ধরন(Cognition) এবং ব্যবহার বা আচরণ(Behavioural) এই তিনটের মধ্যে যোগাযোগ

ভেঙ্গে যাওয়া বা আলাদা হয়ে যাওয়া বা Split হয়ে যাওয়াকে বোঝায়!অর্থাৎ মনের এই তিনটে ব্যবহারিক উপাদানের মধ্যে কোন সু-সামঞ্জস্য না থাকা। Bleuler এর আগে অবশ্য ১৮৫৩ সালে Benedict Morel এইরকম রোগের নাম করেন Demence Precoe।তারপরে Kahlbaum (১৮৭১)আর তার ছাত্র Hecker(১৮৭৪) বর্ণনাতেও উঠে আসে এই রোগের এর কথা। প্রখ্যাত জার্মান সাইকিয়াট্রিস্ট Emil Kraeplin এই রোগের নাম করণ করেন Dementia Praecox।শেষে ১৯০৮ সালের ২৪শে এপ্রিল সুইস সাইকিয়াট্রিস্ট Dr. Eugen Bleuler বার্লিনে এক লেকচারে এই Schizophrenia শব্দটি প্রথম ব্যবহার করে তার বর্ণনা করলেন চারটি "A"এর মাধ্যমে যাকে বলা হয়4A- Loosening of Associciations (সঙ্গতিহীন চিন্তা ভাবনা ও কাজ),Blunting of Affect(কোনো রকম অনুভুতি না থাকা), Autism(Self-absorbed একমাত্র নিজের মতো করে কাজ করা) আর Ambivalence (সংশয় এর মধ্যে থাকা)। পরবর্তীতে আর এক জার্মান ডাক্তার Kurt Schneider ১৯৩৯ সালে সিজোফ্রেনিয়া ডায়াগনোসিস এর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিম্পটোম এর কথা বললেন -যা First Rank Symptoms (FRS) নামে পরিচিত।

১৯৮৬ থেকেই National Schizophrenia Foundation ফ্রান্সের Dr. Philippe Pinel (1745-1826) (যিনি মানসিক রোগ নিয়ে অনেক কাজ করেছেন, Dementia (ডিমেনসিয়া) শব্দটি উনিই প্রথম ব্যবহার করেন) তাকে সম্মান জানাতে ২৪ শে মে প্রতিবছর এই দিনটি সিজোফ্রেনিয়া দিবস পালনের জন্যে বেছে নেয়! এই বছর ২৩শে মে থেকে ২৭ শে মে Schizophrenia Awareness Week (SWA) সিজোফ্রেনিয়া সচেতনতা সপ্তাহ পালিত হচ্ছে-এইবারের থিম হল- “Discover Better Mental Health”. যেভাবে মানসিক রোগের স্টিগমা এবং বাছবিচারের জন্যে অনেকেই চিকিৎসা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন!বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি থাকা সত্ত্বেও স্টিগমা এবং বৈষম্য এর জন্যে অনেকই শুরুতে চিকিৎসা করাতে চান না! এবং রোগ অনেকবেশি chronic আকার ধারন করে! আর যেহেতু Schizophrenia একটি ব্রেইন ডিসঅর্ডার তাই ওষুধ খেতেই হবে!এবং মনে রাখতে হবে এটা এমন এক অসুখ যাকে সারানো যায়! সমস্ত পপুলেশানের মধ্যে এর prevalence ১% এর একটু বেশি। NMHS (National Mental Health Survey 2015-16) অনুযায়ী এর prevalence ০.8% অর্থাৎ ভারতের প্রায় ৫-৬ মিলিয়ন(৫০-৬০ লাখ) লোক এই রোগ নিয়ে ভুগছেন!

Schizophrenia এর ডায়াগনোসিস হয় রোগীকে ক্লিনিকাল ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে! কোন মাথার স্ক্যান বা রক্তের পরীক্ষা নয়!

DSM-5 অনুযায়ী Schizophrenia এর রোগীদের যে সিম্পটোম গুলি থাকে-

Delusion (একটা মিথ্যে অপরিবর্তনীয় স্থির বিশ্বাস যা রোগীর নিজস্ব সংস্কৃতি শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থানের সাথে মিল খায় না)

Halluniaction (কোন রকম বাহ্যিক উদ্দীপনা ছাড়াই একটা বাস্তবিক অনুভুতি যা একদম সত্যিকারের মতো)
Disorganised Thought and Speech (চিন্তাভাবনার স্বাভাবিক বিন্যাস থেকে লাইনচ্যুত হওয়া বা অসংলগ্ন কথা বলা)
Grossly Disorganised Behaviour (আচরনের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক খুঁজে না পাওয়া এক অদ্ভুতরে ব্যাখাতীত আচরণ)
Negative Symptoms (অনুভুতির প্রকাশ স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কমে যাওয়া!)
সাধারণত ছয় মাসের বেশি এই সিম্পটোমে গুলির মধ্যে দুটি বা তার বেশি থাকলে এবং যদি রোগীর কাজের জায়গা, নিজের কেয়ার নেওয়া ও পারস্পরিক সম্পর্কগুলো অত্যাধিক মাত্রায় প্রভাবিত হয় তাহলে আমরা Schizophrenia এর কথা ভাবতে পারি! আসলে সাইকিয়াট্রিস্ট দের কাছেও সিজোফ্রেনিয়া খুব চ্যালেঞ্জিং ও জটিল এক রোগ। সিম্পটোম এর দিক দিয়ে খুব Heterogenous(অসমসত্ত্ব) একটা অসুখ। তাই এক এক একজন সিজোফ্রেনিয়ার রোগী এক একরমের হয়। কেউ হয়তো খুবই উত্তেজত, কেউ খুব আক্রমণাত্মক, কেউ বা হয়তো ঝিমিয়ে আছে, কেউ নিজের মতো হাসছে নিজের মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে, কেউ হয়তো নিজের যত্ন একেবারেই করতে পারছে না, খাওয়া দাওয়া করছে না, রাস্তায় রাস্তায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কেউ বা সবার থেকে আলাদা হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নেন। তাই কোনো একরকম সিম্পটোমগুচ্ছো দিয়ে সিজোফ্রেনিয়াকে ব্যাখ্যা করা মুশকিল।
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে ধরণের সিম্পটম দেখা যায় তা হল-
কারও উপস্থিতি ছাড়াই তার আওয়াজ কানে পরিস্কার শুনতে পাওয়া (Auditory Hallucination)
আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি ও আমাকে মারতে আসছে এই রকম বলে উত্তেজিত হয়ে ওঠা(Visual Hallucination)
লোকজনকে সবসময় সন্দেহ করা(Paranoid Ideation)
সারাক্ষণ একটা ভয় ও ভীতি এর মধ্যে থাকা।(Fearful Episode)
নিজেকে একদম আলাদা করে নেওয়া (Social Withdrawal)
নিজের অনুভূতির প্রকাশ একদম কমে যাওয়া(Emotional Blunting)
বেশিক্ষণ ধরে মনোযোগ না রাখতে পারে (Poor attention) এবং ভুলে যাওয়া(Memory Disturbance)

সাধারত ছেলেদের ক্ষেত্রে এটি ১৫-২৫ বছরের মধ্যেই শুরু হয়!মেয়েদের মধ্যে এই রোগের সূত্রপাত একটু দেরিতে হয় এবং এর বাইমোডাল ডিস্ট্রিবিউশান(Bimodal onset Peak) দেখা যায় -
একদল ২৫-৩৫ বছর আর একদলের ৪৫ বছরের এর পরে গিয়ে রোগের শুরু হয়! অন্যদিকে বাচ্চাদের সিজোফ্রেনিয়া (Childhood Schizophrenia) শুরু হয় ১২-১৩ বছর এর একটু আগে থেকে!
সিজোফ্রেনিয়াতে সেই রোগের পাশাপাশি অন্যান্য রোগও থাকতে পারে! বিশেষ করে Tobaco এবং Cigarettes এরা নিয়মিত ব্যবহার করেন !
অন্যান্য নেশাজাতীয় দ্রব্যও ব্যবহার করে থাকতে পারেন।সাধারণ পপুলেশানের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় OCD(Obssesive Compulsive Diosrder) সিজোফ্রেনিয়ার রোগীদের থাকে!এছাড়া ডিপ্রেসিভ এপিসোডও থাকতে পারে!এদের মধ্যে ১৫-৩০ % সুইসাইড এর চেষ্টা করেন। ১০% মারা যান সুইসাইডে! আবার ১০-১৫ % Schizophrenia এর রোগীরা স্বাভাবিক সময়ের আগে মারা যান!

Schizophrenia কোনো একটা কারণে হয় না অনেক কারণ রয়েছে। Geentics, Immunological, Biochemical, Neurodevlopmental, Psychological থিওরি আছে! তাই বলা হয় Multifactorial Polygenic Brain Disorder।

চিকিৎসা পদ্ধতির প্রধান জায়গা হল- মেডিকেশানের উপর থাকা এই রোগের চিকিৎসার মূল জায়গা! বিশেষত Anti-Psychotic Drug এবং তাকে সাপোর্ট করার জন্যে বিভিন্ন ওষুধ ও তাদের কম্বিনেশান!
Psychoeducation,Family Therapy, Social Skill Training (SST) Token Economy এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ!

কতদিন ধরে ট্রিটমেন্ট চালবো??

এটা একটা খুবই প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যতটা একজন বাড়ির লোকের কাছে ততটাই একজন চিকিৎসকের কাছে! কতদিন চিকিৎসা চলবে তা নির্ভর করে বিভিন্ন বিশয়ের উপর-

(১)রোগটা কতদিন ধরে আছে এবং তার তীব্রতা কতোটা

(২)কতগুলো এপিসোড হয়েছে মানে বাড়াবাড়ি রকমের

(৩)কতবার Relapse(রোগ ফিরে ফিরে আসা) হয়েছে

(৪)বাড়িতে কারও এই ধরনের রোগ আছে কিনা!

(৫)ওষুধ খেয়ে রেসপন্স কেমন??

তবে ওষুধ বন্ধ করার আগে অবশ্যই ডাক্তারবাবুর সাথে কথা বলবেন! দেখা গেছে বার বার এটা যে রোগী ঠিক হয়ে যাবার পরে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং রোগ আবার নতুন চেহারানিয়ে ফিরে এসছে! IPS(Indian Psychiatric Society এর গাইডলাইন অনুযায়ী)সাধারণত প্রথম এপিসোডের ক্ষত্রে ১-২ বছর এবং অনেক কটা এপিসোড হলে মিনিমাম ৫ বছর ওষুধ চালানো উচিত! তবে কতদিন ধরে রোগ আছে, সুইসাইড করার প্রবণতা থাকলে অন্যকে ক্ষতি করার আচরণ থাকলে খুব অ্যাগ্রেসিভ হলে কিম্বা অন্য অসুখ থাকলেঅনেকদিন কখনো কখনো সারাজীবন ওষুধ চলতে পারে!

Schizophrenia কিভাবে এগোবে এবং শেষ পরিনতি কি হবে তা একবাক্যে বলা যায় না! বিভিন্ন ফ্যাক্টরের উপর এই Prognosis (আরোগ্য সম্ভাবনা) নির্ভর করে।সাধারণত যাদের রোগ জীবনের পরের ধাপে (৪০ বছর পরে) শুরু হয়,ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের,রোগ শুরুর আগে কোন বাহ্যিক কারণ থাকে, রোগ শুরুর আগে(Premorbid Personality) যারা খুব সুস্থ ছিলেন, মস্তিষ্কের কোন গঠনগত জায়গা নষ্ট(Structural Damage of Brain) হয় নি নেই, যাদের সুইসাইড করার চিন্তা বা প্রবণতা কম, যারা বিবাহিত, যাদের ফ্যামিলি সাপোর্ট ভালো, তাদের ক্ষেত্রে Prognosis ভালো!

Manfred Bleuler (যিনি Eugen Bleuler এর ছেলে) বলেছিলেন এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ করে ভালো হয়ে যায় যায়, এক তৃতীয়াংশ মোটামুটি কম-ভাল মিশিয়ে থাকে, আর এক তৃতীয়াংশ দীর্ঘদিনের (Chronic) রোগে পরিণত হয়! পরবর্তী কালেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে-

এক দল,মোটামুটি ৩০-৪০% লোকজন একটা এপিসোড হয় এবং ১ বছর ওষুধ খেয়ে একদম ঠিক হয়ে যায়!সমস্ত কাজকর্ম করতে পারে কোন রকম ওষুধের দরকার পরে না!

আর একধরনের ৩০-৪০ % লোকের অনেক এপিসোড থাকা সত্ত্বেও ওষুধ খেয়ে সুস্থ থাকেন!

তিন নাম্বার গ্রুপের লোকজন ১০-২০% ওষুধ খেয়ে সম্পূর্ণরুপে সুস্থ হয় না! ওষুধ খেয়ে পজিটিভ সিম্পটোম নিয়ন্ত্রনে চলে আসে কিন্তু ওষুধ বন্ধ করলেই বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে যায়!

বাকি ১০% প্রথম থেকেই ওষুধ খেয়ে কিছু হয় না! যাকে বলে Treatment Resistant Schizophrenia (TRS) তবে বিভিন্ন কারণে এর পারসেন্টেজ বেড়ে দাঁড়ায়! ২০-৩০% এর এসে কাছাকাছি! তাদের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ওষুধ বিভিন্ন উপায়ে ড্রাগ কম্বিনেশানের মাধ্যমে সিম্পটোম নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্টা করা হয়!

আমাদের সামনে কি কি চ্যালেঞ্জ ??

সবচেয়ে বড় সমস্যা হল স্টিগমা ও বৈষম্য! Schizophrenia এর ক্ষেত্রে তো বটেই যেকোনো মানসিক সমস্যার ক্ষেত্রেই এটা হয়! একজন হাই প্রেশার বা ডায়াবেটিস এর রোগী যতটা সহজে চিকিৎসা পান একজন Schizophrenia রোগী সেই সহজে চিকিৎসা পান না!

প্রত্যন্ত গ্রামের দিকে চিকিৎসার সহজলভ্যতা নিয়েও প্রশ্ন আছে! কতো সহজে ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে কিনা!বাড়ির লোকেরাও প্রথম দিকে রোগীর সমস্যামূলক আচরণ শুরু হলেও নজর দেন না!

এই ট্রিটমেন্ট গ্যাপ ৭৫%। তারমানে ২৫% Schizophrenia রোগীরা শুধু চিকিৎসা পান! ভারতবর্ষে প্রায় ১৪০ কোটি জনসংখ্যা! তার মধ্যে-

Psychiatrist এর সংখ্যা ৯০০০ এর কাছাকাছি
Clinical Psychologist ৩০০০ এর কাছাকাছি
Psychiatric Nursing (যারা M.Sc in Psychiatry Nursing করেছেন) ২০০০ এর মতো
Psychiatric Social Worker ২০০০ এর মতো
হিসেব করে দেখলে সাইকিয়াট্রিক বেড এর সংখ্যাও খুব অল্প! একটা হিসেব হচ্ছে ভারতে
মানসিক হাসপাতাল আছে ৪৩ টি মেডিকেল কলেজ ৫৪২ টি ডিসট্রিক্ট হাসপাতালের সংখ্যা ৭১৮ টি। সব মিলিয়ে আনুমানিক হিসেবে বেড এর সংখ্যা হবে ৩৭ হাজারের মতো সরকারি জায়গায়!
এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই জায়গায় গুলোতে Homeless People যাদের নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই , যারা দীর্ঘকালীন ভাবে কোন রোগে ভুগছেন বাড়ির লোক নেই বলে কমিউনিটিতে ফিরে যাবার সম্ভাবনা কম তারাই থাকেন।

আর একটা গুরুত্বপূর্ণ হল- Disability Certificate। প্র্যাক্টিকাল সমস্যা হল অন্য কোন শারীরিক প্রতিবন্ধকতার মতো Schizophrenia এর Disability (অক্ষমতা) তো বাইরে থেকে বোঝা যায় না!আর Schizophrenia এর রোগীদের Insight(নিজের রোগ আছে কি নেই তাকে বুঝতে পারার ক্ষমতা) খারাপ থাকে!মানসিক রোগ যে Disability তৈরি করতে পারে তা একটা সমাজের একটা বড়ো অংশের মানুষই মনে করনে না! বরঞ্চ তারা মনে করেন এইসব রোগীরা ইচ্ছে করে করছে! তাই Disability Certificate পেতে খুব সমস্যা হয়!
অন্যদিকে পারিবারিক দিক থেকে ডিভোর্সের সম্ভাবনা বাড়ে!ফ্যামিলি সাপোর্ট যেখানে সবচেয়ে জরুরি তা ভেঙ্গে পড়ে!বেকারত্ব এবং কাজে করতে পারায় তারা যেকোনো পরিবারের কাছে বোঝা হয়ে ওঠেন!যেকোনো রকম চাকরি খুঁজতে গেলে তাঁরা সামাজিক ভাবে গ্রহনযোগ্যতা পান না। যদিও বা কেউ উচ্চশিক্ষিত হন সহজে চাকরিতে জয়েন করতে পারেন না!পরিবারের লোকেরাও ধীরে ধীরে হতাশ হয়ে যান! Schizophrenia এর রোগীরা তাই আরও বেশি একা হতে শুরু করনে।

এই সমস্যা থেকে সমাধানের দিকে কি কি ভাবে আমরা এগোতে পারি??

এক, সবার আগে Mental Helath Care Act, 2017 এবং Right to the Persons with Disability Act (RPwD Act 2016) যেখানে মানসিক রোগীদের ন্যায্য দাবির কথা বলা আছে !এই দুটো আইনই একটা landmark আইন!একে দেশের সব জায়াগায় সঠিক ভাবে লাগু করা !যেখানে রুগীদের মানবধিকার নিয়ে কথা বলা আছে!Mental Helath Care এখন একটা অধিকারের প্রশ্ন তাই!
দুই, সব জায়গায় ইনডোর সার্ভিস এবং আউটডোর সার্ভিস জোরদার করা। গুরুত্বপূর্ণ Psychotropics Drugs এর জোগান দেওয়া! Rehabitilation সেন্টার গুলোকে আরও সক্রিয় করে তোলা!
যদি এই সার্ভিস গুলো সঠিক ভাবে না থাকে তাহলে যে কোন রোগী বা তার পরিবার Mental Helath Care Act, 2017 অনুযায়ী সরকারকে এটা প্রশ্ন করতে পারে!
যে নিজের অধিকার তিনি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জানাতে পারে এবং স্টেট বা সরকার তা শুনতে বাধ্য!কোনও কিছুর অজুহাত না দেখিয়ে স্টেট বা সরকারের দায়িত্ব হল- Mental Helath Care সেই রোগের পৌঁছে দেওয়া যা থেকে উনি বঞ্চিত হচ্ছেন!
তিন, পরিবারের লোকজন এর সহযোগিতা এই রোগের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ! একজন Chronic Schizophrenia এর রোগীর সঠিক পরিচর্জার জন্যে একজন লোক কে সবসময় তেই থাকতে হয়!
তাহলে সেই Care Giver এর একটা বড় সময় এখানে কেটে যায়! তাই Care Giver Pension এখন চর্চিত একটা ইস্যু!যে বাবা বা মা নিজের ছেলে বা মেয়ের দেখ-ভাল করার জন্যে নিজের পুরো জীবন
দিয়ে দিলো স্টেট কে তার দায়িত্ব নিতে হবে! একে অবিলম্বে লাগু করা উচিত!
চার, একদম শেষতম প্রান্তিক লোকটির কাছেও আমাদের পৌঁছে যেতে হবে! একটা Welfare Society তে সেটাই তো কাম্য! কখনো Proactive approach নিয়ে কমিউনিটিতে আমাদের উপস্থিতি বাড়াতে হবে।

পাঁচ, আগেই বলেছি Schizophrenia এর রোগীদের মেডিসিন চালিয়ে যাওয়া উচিত! এই মহামারির সময়ে কিভাবে ওষুধ এর জোগান দেওয়া হবে তা ঠিক করতে হবে! Tele-Psychiatry এবং Tele-Psychotherapy Servicies চালু করা করা আরও বেশি সহজলভ্য করে তোলা! শুর করা! এই কথা গুলো হয়তো খুব আইডিয়াল শুনতে খুব ভালো! কিম্বা তাত্ত্বিক বা থিওরিটিকাল। বাস্তবে কতোটা রূপায়িত করা সম্ভব তা নিয়ে অনেকেরই প্রশ্ন আসে মনে!
যদি সঠিক রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকে, যদি প্রশাসনিক দক্ষতা আর সঠিক ব্যবহারিক জিনিসপত্রের জোগান থাকে তবে সমস্ত কিছু করা সম্ভব।যেখান থেকে আমরা ৬০-৭০% সমস্যার সমাধান করতে পারি।
ভ্যাক্সিনেশানের ক্ষেত্রেও এটা দেখা গেছে যে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে মানসিক রোগীরা অনেক বেশি বৈষম্যের স্বীকার হচ্ছেন! এখন সময় এটাকে আলাদা করে গুরুত্ব দেওয়ার বয়স্কদের পাশাপাশি মানসিক রোগীদের বিশেষ করে ডিমেনসিয়া বা সিজোফ্রেনিয়া রোগীদের ভ্যাক্সিন দেওয়া উচিত! কার আধার কার্ড বা অন্য ID Card আছে কি নেই তা দেখতে গেলে মুশকিল! অনেক দিন ধরে ভোগা বেশির ভাগ মানসিক রুগীদের কাছেই কোনো পরিচয় পত্র থাকে না! অনেক জায়গাতেই এটা শুরু হয়েছে-বিশেষ করে কর্ণাটকে আধার কার্ড বা অন্য ID Card ছাড়া মানসিক রোগীদের ভ্যক্সিন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে!

পৃথিবী বিখ্যাত লেখক Jonathan Harnisch একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন "I have schizophrenia. I am not schizophrenia. I am not my mental illness. My illness is a part of me." অতএব কাউকে সিজোফ্রেনিক বলে সহজে চিহ্নিত বা স্টিগমাটাইস করে দেবো না।বর্নণা দেওয়া উচিত একজন মানুষ যার সিজোফ্রেনিয়া আছে-এই ভাবে। A person with mental illness. এইটা বলার মধ্যে দিয়ে শুরু করতে হবে!

সবশেষে এটাই বলার যদি শুরু থেকে রোগীর লক্ষ্মণ বুঝে চিকিৎসা করা যায়! তাহলে Schizophrenia ভয়াবহ আকার নেওয়ার সম্ভাবনা কম! যেহেতু মানসিক রোগ কে নিয়ে ছুঁতমার্গ এবং স্টিগমা এর জন্যে প্রথমে কেউ গুরুত্ব দেয় না! আর ওষুধ অনেক সময়েই রোগীরা খেতে চান না! বা অনিহা থাকে(যাকে বলে Poor Adherence)!তখন বাড়ির লোককে দায়িত্ব নিয়ে তখন ওষুধ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হয়! (supervised medication)বার বার বলছি ওষুধ বন্ধ করা যাবে না- যদি কেউ মনে করে আমার রোগী ঠিক হয়ে গেছে ওষুধ বন্ধ করে দিয়ে দেখি তাহলেই কিন্তু আবার ফিরে আসবে! মনে রাখবেন একটা বড়ো অংশের(৬০-৭০%) লোক কিন্তু Schizophrenia তে ওষুধ খেয়ে প্রায় সুস্থ থাকেন!
তাই সঠিক চিকিৎসার মধ্যে থাকা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পেশাদার ডাক্তারের সাহায্য নেওয়া, নিয়মিত ওষুধ খাওয়া ও পরিবারের পাশে থাকা, সুস্থ Rehabilitation প্রক্রিয়া সব মিলিয়ে সিজোফ্রেনিয়াকে আমরা জয় করতে পারি!

গোলটেবিলে সাফ জবাব। প্রসঙ্গে : স্বামী বিবেকানন্দ।

-অভিষেক দে

যদি প্রশ্ন করা হয় স্বামী বিবেকানন্দ কে ছিলেন, তাহলে এককথায় এর উত্তর হচ্ছে, উনি ছিলেন একজন স্ববিরোধী সন্ন্যাসী। রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগরের মতন এমন কোনও উল্লেখযোগ্য কাজ করেননি যার জন্যে স্বামীজির নামে আবেগাপ্লুত হতে হবে। কিন্ত অন্ধভক্তদের এসব বোঝানো কঠিন। স্বামীজি কে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে কিছু সমালোচনামূলক লেখার চেষ্টা করলেই কিছু অন্ধভক্তরা হা রে রে করে ছুটে আসবেই। তারপর শুরু হবে আক্রমণ। গালাগাল, হুমকি, খিস্তি কিছুই বাদ যাবেনা।

কোনো মানুষ ই সমস্ত দোষ ত্রুটি মুক্ত নয়। কারন দোষ মুক্ত মানুষের অস্তিত্ব কখনোই সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ ও এর বাইরে নয়। এমন অনেকেই আছেন যারা বিবেকানন্দ কে চেনেন কিছু ভালো ভালো বাণী সংকলিত ঐ ১০/২০ টাকা দামের বই পড়ে নয়তো অন্যের মুখ থেকে শোনা কথায়।

আসলে - "সত্য ঠিক ততটাই প্রকাশিত হয় যতটা আমরা জানতে চাই অথবা আমাদেরকে জানানো হয় "। লাগাতার প্রচারের ফলে বিবেকানন্দ কে মহাপুরুষ, বিজ্ঞানীদেরও বিজ্ঞানী, তরুণ প্রজন্মের আদর্শ, সৎ, প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী ইত্যাদি নামে চালানো হয়েই চলেছে। এর পেছনে একটা বড় উদ্দ্যেশ্য তো অবশ্যই আছে। স্বামী বিবেকানন্দ কে চিনতে, জানতে, বুঝতে -

দশ খন্ডের বাণী ও রচনা,
পত্রাবলি,
স্বামীজি কে যেরুপ দেখিয়াছি,
স্বামী শিষ্য সংবাদ,
জ্ঞানযোগ, রাজযোগ,
বিবেকানন্দ ও বাঙালির বিবেক,
সেকুলার বিবেকানন্দ,
বিবেকানন্দ অন্য চোখে,
ইত্যাদি বই গুলো বেশ ভালো ভাবে এবং পাতায় পাতায় নিজের যুক্তিবোধ দিয়ে পড়া খুবই প্রয়োজন। অনেকের বাড়িতেই বিবেকানন্দ রচনাবলী থাকতে দেখা যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের প্রায় কেউই সেসব বই পুরো টা পড়েননি। অবশ্য না পড়ে না জেনে জ্ঞান দেওয়াও একটা বিরাট মাপের শিল্প।

বিজ্ঞান বিরোধী, স্ববিরোধী বিবেকানন্দর পুর্নাঙ্গ জীবনী মন দিয়ে পড়লেই জানা যায় তিনি কেমন মানুষ। আজ একরকম বলছেন তো পরের দিন আরেক।

যে কারনে রামমোহন কিংবা বিদ্যাসাগর মহাশয় কে শ্রদ্ধা করি, ঠিক তার বিপরীত মেরু তে অবস্থানকারী বিবেকানন্দকে সন্মান জানানো সম্ভব নয় কোনো মুক্তমনের যুক্তিবাদী মানুষের। তিনি, অনেক স্ববিরোধী কথা বলেছেন। জীবনে এমন কিছু করেছেন যা মানবতার বিরোধী। আবার যদি বলা হয় বিদ্যাসাগর, রামমোহন এনারা যা যা কাজ করেছেন আমরা জানি কিন্তু বিবেকানন্দ এমন কি করেছেন সমাজের জন্য? তখন আবার ব্যক্তি আক্রমণ ছাড়া কোনো সুস্পষ্ট উত্তর পাবেন না। আপনি মানুন অথবা না মানুন এটা সত্য যে, উনি অর্থাৎ স্বামীজি, জাত-পাত, অস্পৃশ্যতা, পশুবলি, সহমরণ প্রথা বাল্যবিবাহ ইত্যাদি অনেক কিছুর পূর্ণরূপে সমর্থন জানিয়েছিলেন। বাল্যবিবাহ, বিধবাদের বিবাহ থেকে নারী স্বাধীনতার বিপক্ষে থেকে প্রমাণ করেছেন উনিও সেই পুরুষশাসিত সমাজের প্রাচীন পন্থী চিন্তাধারা থেকে মোটেই বেরিয়ে আসতে পারেন নি।

অপ্রিয় সত্য এটাই যে, প্রগতিশীলতার মুখোশের আড়ালে ভন্ড সন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দই বলছেন "জ্ঞানোন্মেষ হলেও কুমোর কুমোরই থাকবে, জেলে জেলে, চাষা চাষা"(স্বামী শিষ্য সংবাদ)। ভাবতে পারছেন কি পরিমাণ জাতিবিদ্বেষ ছিলো আবার বলেছেন "বিধর্মী জাতিদের ভেতরে আদান প্রদান হওয়ার কথা আমি বলি না।" (বাণী ও রচনা, নবম খন্ড)

একজন ব্যক্তি নারীদের প্রতি কেমন দৃষ্টিভঙ্গি রাখতেন তার ওপর ব্যক্তিত্ব বুঝতে পারি ইনি কি বলেছেন, "ভক্তের বাড়িতে স্ত্রী ভক্তের হাতের রান্না খেওনা এতে মন নিম্নমুখী হয়" আবার বলেছেন,"কায়মনোবাক্যে পতিসেবা করাই স্ত্রী লোকের প্রধান কর্ম"। (শ্রীমতি ইন্দুমতী মিত্রর প্রতি পত্র)

এরকম একগাদা কথা পাতায় পাতায় ছড়িয়ে, কিন্তু না পড়লে জানবেন কিভাবে?

যাদের মনে হবে ভুল বলেছি তাদেরকে অনুরোধ করবো পুর্নাঙ্গ বিবেকানন্দ কে পড়েই দেখুন এবং মিলিয়ে নিন আমার কথা। সত্য কিন্তু কখনো চাপা থাকেনা, একদিন সেটা ঠিকই প্রকাশ পাবেই। সেদিন খুব দূরে নয় যখন মানুষ নিজেই চিনে নেবেন বিদ্যাসাগর না বিবেকানন্দ কাকে আদর্শ হিসেবে মেনে নেবে আগামী প্রজন্ম।

যারা বিভিন্ন সভা সমাবেশে সোচ্চারে দাবী করেন যে স্বামীজি একজন খাঁটি মানুষ বিজ্ঞানীদেরও বিজ্ঞানী তাদের উদ্দেশ্যে একটি বক্তব্য বলেই শেষ করি, বেশ মজাদার বক্তব্য। বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, অখন্ড বাংলা সংস্করণ, প্রকাশক -নবপত্র, পৃষ্ঠা - ২৬৪ থেকে -

" একটি ইস্পাতের পাত গড়ে তাকে কম্পিত করতে পারে এ রকম একটা শক্তি এতে প্রয়োগ কর। তারপর কি ঘটবে? যদি একটা অন্ধকার ঘরে এই পরীক্ষাটি করা হয়, প্রথমে তুমি শুনতে পাবে একটি শব্দ - একটি গুনগুন শব্দ। শক্তিপ্রবাহ বর্ধিত করো,দেখবে ইস্পাতের পাতটি আলোকময় হয়ে উঠেছে। শক্তি আরও বাড়িয়ে দাও,ইস্পাতটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যাবে। ইস্পাতটি মনে রুপান্তরিত হয়ে গেছে"।।

একবার ভাবুন তো, স্বামীজি কতবড় বিজ্ঞানী দের ও বিজ্ঞানী!! ইস্পাতের মাধ্যমে " মন " কেও যে তৈরি করা সম্ভব সেটা বিবেকানন্দই প্রথম আবিষ্কার করেছেন।

বাল্যবিবাহ সমর্থনকারী বিবেকানন্দ, নাকি এর বিরোধী বিদ্যাসাগর?বেদান্তবাদী বিবেকানন্দ, নাকি বেদান্তবিরোধী বিদ্যাসাগর? বিধবা বিবাহের বিরোধী বিবেকানন্দ, নাকি সমর্থক বিদ্যাসাগর? ভাববাদের মুখোশের আড়ালে অন্ধবিশ্বাস এবং কু-সংস্কারকে প্রাধান্য দেওয়া বিবেকানন্দ, নাকি মুক্তমনা বিদ্যাসাগর? কাকে বেছে নেবে আগামীপ্রজন্ম সেটা অবশ্যই জোর গলায় বলতে হবে এবং স্পষ্টভাবে।

তাই নিজে পড়ুন, জানুন, সত্য কে উপলব্ধি করতে শিখুন। আগামীপ্রজন্মের মাথায় ভাববাদ অন্ধগুরুবাদ, অন্ধভক্তি, অন্ধশ্রদ্ধা ইত্যাদি না ঢুকিয়ে তাঁদেরকে মুক্তমনে ভাবতে শেখান। মুক্তমনা, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী গড়ে তুলুন আপনার আগামীপ্রজন্ম কে।

> ‘দেশকে সাদা ভাবে দেশ বলে জেনে যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চিৎকার করে মা মা বলে, দেবী বলে মন্ত্র পড়ে, তাদের সেই ভালবাসা দেশের প্রতি তেমন নয়, যতটা নেশার প্রতি।’
>
> -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছু খবর:

১। বুজরুকির পর্দা ফাঁস বিজ্ঞান মঞ্চের

এই সময়, বনগাঁ: স্বয়ং কালীঠাকুর নাকি ভর করেন তাঁর উপর। প্রতি শনি-মঙ্গলে 'দরবার' বসত 'সাধক' রবীন দাসের। জ্বর-পেটখারাপ, চাকরি, বিয়ে, জমি বিবাদ সবেরই সমাধান বাতলে দেন রবীন। খবর পেয়ে বনগাঁয় রবীনের গ্রামে হানা দেন বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী মঞ্চের সদস্যরা। বিপদ বুঝে বুজরুকির কথা স্বীকার করে নেন রবীন।

সীমান্ত শহর বনগাঁর প্রত্যন্ত গ্রাম চাদার বিনয় কলোনিতে বাস রবীন দাসের। তাঁর বাড়িতেই রয়েছে কালীমন্দির। প্রতি মঙ্গল ও শনিবার ঠাকুর নাকি ভর করেন রবীনের উপর। এই দু'দিন মন্দিরের চাতালে বসেন রবীন। আর আশপাশের গ্রাম থেকে মানুষজন এই শনি -মঙ্গলে ভিড় জমান রবীনের কালীমন্দির চত্বরে। এই ভরে পড়াটা বেশ কয়েক বছর ধরেই চলে আসছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শুধু রবীন নয়, তাঁর সঙ্গে আরও তিন মহিলাকেও কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতা ভর করে। রবীন ও তাঁর তিন মহিলা সঙ্গী এই ভরে থাকা অবস্থায় লোকজনের দুঃখ-কষ্ট শোনেন। সমাধানের পথ বাতলে দেন। কেউ বাতের ব্যথায় কাবু তো কেউ দেনায় ডুবে রয়েছেন। কারও বিয়ে টিকছে না তো কারও সন্তান হচ্ছে না। সবই মনযোগ দিয়ে শোনেন রবীনরা। তারপর ভক্তদের সমস্যা বুঝে কারও হাতে ফুল, কারও হাতে বেলপাতা অথবা মাটি, শিকড়, মাদুলি, তাবিজ দেন। এ সবই সমস্যার সমাধান।

অনেকেই নাকি রবীনের টোটকায় উপকার পেয়েছেন। তাই ভক্তের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছিল। ভক্তের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীনের পরিচিতিও আশপাশের গ্রাম পেরিয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ছিল। সেভাবেই রবীনের কথা জানতে পারেন বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী মঞ্চের সদস্যরা।

এ দিন মন্দির চত্বরে ভক্ত সেজে হাজির হন বিজ্ঞান মঞ্চের কয়েকজন সদস্য। কিন্তু কোনও ভাবে তা কানে ওঠে রবীনের। বিপদ আঁচ করে খানিক বাদে রবীন বলে ওঠেন আজ কেউ মাছ-মাংস খেয়ে এসেছেন। তাই মা আসছেন না। আপনারা আজ ফিরে যান। তখন বিজ্ঞান মঞ্চের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এর আগেও মাংস খেয়ে এসেছি। তখন তো ঠাকুর আপনার উপর ভর করেছিলেন। আজ কেন হচ্ছে না? আপনি মাকে নিয়ে আসুন। আমরা অপেক্ষায় আছি।' এরপরই নিজেদের আসল পরিচয় দেন বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা। তাঁদের সঙ্গে গলা মেলান ভক্তদের আনেকেই। সুযোগ বুঝে মন্দিরের ভেতরে ঢুকে দোর এঁটে দেন রবীন। তাল বুঝে চম্পট দেয় রবীনের সঙ্গী তিন মহিলাও। মন্দির চত্বরে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়।

একটু পর দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন রবীন। বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা চেপে ধরলে বুজরুকির কথা স্বীকার করে নেন। করজোড়ে গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন। ভবিষ্যতে কোনও দিন এ সব করবেন না বলে কথাও দেন। এরপর বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা গ্রামবাসীদের অন্ধ বিশ্বাসের কবল থেকে বেরিয়ে আসার অনুরোধ করেন। বিজ্ঞান মঞ্চের কথায় সবচেয়ে বেশি সাড়া আসে মহিলাদের কাছ থেকেই।

https://eisamay.indiatimes.com/west-bengal-news/kolkata-news/buzruki-seen/articleshow/71070677.cms

২। 'নাসা' যাওয়ার ডাক পেল পুরুলিয়ার কিশোরী

" ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি " র সহ সভাপতি এবং পুরুলিয়া শাখা সম্পাদক মধুসূদন মাহাত কে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। তার প্রচেষ্টায় ফাঁস হয়েছিল এক বিশাল বুজরুকি। বিস্তারিত জানতে পড়ুন..

আনন্দবাজার পত্রিকা :
নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরুলিয়া, ১৯ অগস্ট, ২০১৯

বড় হয়ে সে মহাকাশে যেতে চায়। তার আগেই, পুরুলিয়া শহরের কিশোরী অভিনন্দা ঘোষের হাতে যেন চাঁদ এসে হাজির। দিল্লির একটি বেসরকারি সংস্থা আয়োজিত বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে সফল হয়ে সুযোগ মিলেছে 'নাসা'-য় পাড়ি দেওয়ার। নবম শ্রেণির ছাত্রীটি বলছে, "খবরটা পাওয়ার পরে আনন্দে কিছু ক্ষণ কথাই বলতে পারিনি। নাসায় যাওয়ার স্বপ্ন এত দ্রুত সফল হবে ভাবতেই পারছিলাম না।"

তেলকলপাড়ার বাসিন্দা অভিনন্দা পুরুলিয়া শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ে। বাবা সজল ঘোষ ও মা সুস্মিতা রায়চৌধুরী শহরের দু'টি স্কুলে ইংরেজি পড়ান। চাঁদে যাওয়ার ব্যাপারে 'ন্যাক' ছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাসের কম্বলের। তবে সে গিয়েছিল ছাদে। জাঁদরেল মাস্টারমশাইয়ের হাত থেকে বাঁচতে বিচ্ছু ছেলে ঘাপটি মেরেছিল চিলেকোঠার ঘরে। আর নাস্তানাবুদ হয়েছিল টেনিদারা। সজলবাবুরা জানাচ্ছেন, অভিনন্দার কিন্তু ছোট থেকে পড়াশোনাই ধ্যানজ্ঞান। চতুর্থ শ্রেণি থেকে প্রতি বছর অলিম্পিয়াডে বসছে। আলাদা ভাবে কোনও প্রশিক্ষণ নেয়নি। অভিনন্দার কথায়, "পরীক্ষা নিয়ে এখন আর ভয়ডর করে না। পরীক্ষাটা উপভোগই করেছি।" জানাচ্ছে, অল্প সময়ে অনেকগুলি উত্তরের মধ্যে থেকে ঠিকটা বেছে নিতে হয়েছিল পরীক্ষায়। আর প্রস্তুতিতে যাবতীয় সাহায্য করেছেন স্কুলের শিক্ষকেরাই।

কৃতী ছাত্রী হিসেবে স্কুলে তার নামডাক রয়েছে। গত নভেম্বরে দিল্লির বেসরকারি সংস্থার বিজ্ঞান অলিম্পিয়াডে স্কুল স্তরের পরীক্ষায় বসেছিল অভিনন্দা। সফল হয়ে সেখান থেকে রাজ্যস্তরে। অগস্টের গোড়ায় দিল্লিতে ইসলামিক কালচার সেন্টারে সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষাটি হয়।

অভিনন্দার স্কুলের শিক্ষক তথা ওই বেসরকারি সংস্থার পরীক্ষার কো-অর্ডিনেটর সুদীপচন্দ্র দাস জানান, সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষায় প্রায় ১৮ লক্ষ প্রতিযোগী ছিল। সফলদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে আমেরিকার 'ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের' (নাসা) 'কেনেডি স্পেস সেন্টারে' নিয়ে যাবে সংস্থা। দলে সুযোগ পেয়েছে অভিনন্দা। স্বাধীনতা দিবসে সংস্থার তরফে স্কুলে ফোন করে সেই খবর দেওয়া হয়। তবে, কবে রওনা হতে হবে সেই কথা এখনও জানানো হয়নি।

স্কুলের পড়াশোনার বাইরে নিয়ম করে পড়ে বিজ্ঞান বিষয়ক বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধ। সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'মিশন মঙ্গল' নামে হিন্দি ছবি। মঙ্গল-অভিযানে একঝাঁক মহিলা বিজ্ঞানীর ভূমিকা তুলে ধরেছেন পরিচালক। ইচ্ছা থাকলেও পড়ার চাপে সেই ছবি দেখা হয়নি অভিনন্দার। তবে তাকে অনুপ্রানিত করেছে 'চন্দ্রযান ২' অভিযানে মহিলা বিজ্ঞানীদের ভূমিকা। মেধাবী ছাত্রীটি বলে, "খবরের কাগজে দেখেছি চন্দ্রযান অভিযানে কী ভাবে নিজেদের দায়িত্ব সুষ্ঠু ভাবে পালন করেছেন মহিলা বিজ্ঞানীরা।"

তারও স্বপ্ন, লাল মাটির দেশ থেকে এক দিন পাড়ি জমাবে লাল রঙের গ্রহে।
খবরের লিংক - https://www.anandabazar.com/district/purulia-birbhum-bankura/purulia-student-got-a-call-from-nasa-after-her-success-in-science-olympiad-1.1033409

৩। যে কোনও ভারতীয়র অধিকার রয়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার', রায় মাদ্রাজ হাইকোর্টের

সমাজ সংস্কারক পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর অনুগত এবং দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সদস্যদের সম্পূর্ণ মৌলিক অধিকার রয়েছে ঈশ্বর এবং ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করার। ঠিক যেমন অন্যদের অধিকার আছে ঈশ্বর বিশ্বাসে। এই রায় ঘোষণা করল মাদ্রাজ হাই কোর্ট।

মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দানের সময়ে বলে, 'মামলাকারীর যদি অধিকার থাকে ভারতীয় সংবিধানের ১৯ ধারা অনুযায়ী ঈশ্বারের অস্তিত্ব এবং ধর্ম সম্পর্কে নিজের মত প্রকাশের, তাহলে সুপ্রিম কোর্টেক লালাই সিং যাদব মামলার উদাহরণ তুলে আমরাও বলছি পেরিয়ার ই ভি রামস্বামীর অনুগত এবং দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সদস্যদেরও ভারতীয় সংবিধান সম্পূর্ণ অধিকার দিয়েছে ঈশ্বরকে অস্বীকার করার। 'ডিভিশন বেঞ্চে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি এস মণিকুমার এবং সুব্রামোনিয়াম প্রসাদ।

১৯৬৭ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর সমাজ সংস্কারক পেরিয়ার ই ভি রামস্বামী জীবিত থাকাকালীন ত্রিচিতে উন্মোচিত হয় তাঁর একটি মূর্তি। উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সি এন আন্নাদুরাই। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে কামরাজও। তাঁর সেই মূর্তির নিচে লেখা হয়েছিল, 'ঈশ্বর বলে কেউ নেই... ঈশ্বরের কোনও অস্তিত্বই নেই। যে ঈশ্বরের জন্ম দিয়েছে সে ভীষণই বোকা। যে ঈশ্বরের প্রচার করেছে সে স্কাউনড্রেল এবং যে ঈশ্বরের আরাধনা করে সে বর্বর, আদিম।'
মামলাকারী এম দেইভানয়াগমের দাবি ছিল, এই ধরনের আক্রমণাত্বক এবং আপত্তিকর মন্তব্য পেরিয়ার কোনওদিনও করেননি এবং তাঁর মৃত্যুর পর এই সব কথা লেখা হয়েছিল মূর্তির নিচে। দ্রাবিদার কাজহাগাম-এর সভাপতি এর বিরোধিতা করে বলেন, 'থানথাই পেরিয়ার আগে থেকেই বুঝেছিলেন, তাঁর মূর্তির নিচে এই কথাগুলি লেখা না হলে কিছু বছর পর তাঁকেই ঈশ্বর জ্ঞানে মানুষ পুজো করা শুরু করবে। সেই জন্যেই এই কথাগুলি তিনি বলে গিয়েছিলেন।'
https://eisamay.indiatimes.com/nation/madras-high-court-declares-that-indian-constitution-has-given-right-to-its-citizens-to-deny-gods-existence/articleshow/71006042.cms

অযোগ্য শাসনকর্তার মতো দেশ ও জাতির বড় ক্ষতি কেউ করতে পারে না।

- এরিস্টটল

বিজ্ঞান কংগ্রেসের কমেডি শো

-জামাল আনসারী

দু হাজার ঊনিশ, ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্মেলন,
বিজ্ঞানীরা পৌরাণিক কাহিনীতে করলেন অবগাহন।।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের বলছি সংক্ষেপে কিছু পন্ডিতের কথা,
তাদের মহামূল্যবান কথা শুনে অনেকের ধরবে মাথা।।

প্রজাপতি ব্রহ্মা করেছিল ডাইনোসরের আবিষ্কার,
মনু থেকে একে একে বিশ্বে মানুষের হল আবির্ভাব।।

ভারতের বিজ্ঞানীরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিল বিবর্তনবাদ।
বিজ্ঞানের সাথে ধর্মের আর থাকল না কোন বিবাদ।।

গণেশের হাতির মাথা প্লাস্টিক সার্জারির উদাহরণ,
হাতির মুন্ডু চাপিয়ে দিলে হবেনা কেন তার মরন!

মহাভারতের যুগে ইন্টারনেট ব্যবহার অবশ্যই ছিল,
ঘরে বসে সঞ্জয়, যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর কিভাবে দিল!

নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদন! ভারতের ক্ষতি নেই তা-তে
পাতি হাঁসগুলিই তো, অক্সিজেন ছাড়ছে মাঠে ঘাটে।।

রামায়ণের যুগে শ্রীলঙ্কাতে অনেক বিমানবন্দর ছিল,
বিমানে(পুষ্পক রথ) করেই রাবন সীতাকে হরণ করিল।।

ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের আরো আছে অবদান,
জ্যোতিষীরা হাত দেখেই বলে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান।।

বিজ্ঞানীদের দাবি,আধুনিক প্রযুক্তির কিবা প্রয়োজন!
ভারতেই পারে গো মূত্রে মরণব্যাধি ক্যান্সার নিবারণ।।

বিশ্বে যা কিছু আবিষ্কার, সবই নাকি ভারতের অবদান!
বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র,আধুনিক মিসাইলের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের কমেডি শো দেখে কি যে হাসি পায়!
বিদেশিরা বলে বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞানেরই দেখা নাই।।

বিলাপ

-প্রদীপ চক্রবর্তী

ধর্ম নিয়ে বড়াই করো,
সত্যিকারের মানুষ নও।
জাতিভেদের ভাইরাস কে,
বলো সবাই;তফাত যাও।

আমি-তুমি মানুষ যখন,
ধর্ম হল মানবতা।
আমাদেরই হৃদয় পুষ্পে,
ভালবাসার মালা গাঁথা।

সূর্য যখন গগণ মাঝে,
পৃথিবীতে আলো ছড়ায়।
সাম্যবাদের ইস্কুলেতে,
যুক্তিবাদী পাঠ পড়ায়।

ধর্ম নিয়ে রাজনীতি,
বন্ধ হোক্ চিরতরে।
মানসিকতাটা সুস্থ হলেই,
ধর্মান্ধরা বিলাপ করে।

'চেতনার অন্বেষণে' পত্রিকার জন্য লেখা ও মতামত পাঠান yuktibadira@gmail.com এ। যুক্তির পথে আমরা। ধন্যবাদ।